সূর্য্যমুখী

উপন্যাস

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

প্রকাশক : শ্রীনলিনীকুমার মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ :
মে, ১৯৩৪
দাম দেড় টাকা

সূর্য্যমুখী
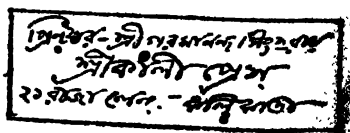
বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

অন্যান্য উপন্যাস :

সাড়া, অকর্মণ্য, মন-দেয়া-নেয়া, রডোডেনড্রন-গুচ্ছ, সানন্দা, যবনিকা-পতন, যেদিন ফুটলো কমল, আমার বন্ধু, ধূসর গোধূলি, হে বিজয়ী বীর, অসূর্যম্পশ্যা।

তাদের বিয়ে হ'লো।

শ্রাবণের এক ছেঁড়া-মেঘ সাঁঝে, অত্যন্ত শান্তভাবে, অনাড়ম্বর, প্রায় চুপে-চুপে, তাদের বিয়ে হ'লো। কেউ জানলে না। মিহিরের সাহিত্যিক-বন্ধুদের মধ্যে কেউ নয়। যে জর্নালিস্ট্ ছোকরা মাঝে-মাঝে তার বাড়িতে আসে তার সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করে' সহরে প্রচার করবার জন্যে, সে-ও নয়। অনুষ্ঠানের কোনো আতিশয্য হ'লো না। মেয়ের বাপের বাড়ির অবস্থাও তার অনুকূল নয়। তারা গরিব—দস্তুরমত গরিব, নিছক গরিব বলতে যা বোঝায়। গরিব ভদ্রলোক—সব চেয়ে ভয়াবহ গরিবত্ব।

অবিশ্যি মিহিরও বড়লোক নয়। না—বড়লোক তাকে কোনোরকমেই বলা যায় না। কিন্তু তার জগতে, তার জীবনে, একজনের আয়ের অঙ্কে কিছু এসে যায় না। কেননা সে কবি। সে আর্টিস্ট্। সে প্রতিভাবান—অনেক তা-ই মনে করে। তার গৌরব, তার মর্য্যাদা—সে সম্পূর্ণ অন্য জাতের। সেখানে তার ব্যাঙ্কের খাতা সম্পূর্ণ অবান্তর। অনেকের বিশ্বাস, বাঙলা কবিতাকে সম্পূর্ণ নতুন রাস্তায় সে নিয়ে গেছে—যদিও তার বয়েস মাত্র পঁচিশ। নিজেকে সে গরিব কি বড়লোক বলে' ভাবতে শেখেনি: সে যে কখনো, কোনো-এক বিকেলে হঠাৎ আধ ঘণ্টার মধ্যে আশ্চর্য্য এবং অনিন্দ্য কয়েকটি লাইন লিখে ফেলতে

পেরেছে, সে-ই তো তার পরম ঐশ্বর্য্য। সেখানে অন্য কিছুরই কথা ওঠে না। তার জীবনের সুরই যে আলাদা। তার ভাবনা, তার মূল্যবোধ, তার সন্ধান—সবই অন্য রকম। সে-সব বুঝবে না দু' পায়ে দাঁড়ানো ব্যাঙ্কের খাতা, পৃথিবীকে যারা ভরে' রেখেছে।

তবু, কবিকেও খেতে হয়। মুদিখানার দেনা মেটাতে হয় তাকেও, বাড়িওয়ালা কবি বলে' খাতির করে না। ইত্যাদি, ইত্যাদি। আজকালকার পৃথিবীতে পয়সা ছাড়া এক পা চলবার উপায় নেই। আত্মার গভীর, গোপন তৃষ্ণা মেটাতেও পয়সার দরকার। পয়সা ছাড়া বই কেনা যায় না। পয়সা না থাকলে অলস অবসরে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে' থেকেও শান্তি নেই।

তার কপাল ভালো, সেটুকু পয়সা ছিলো এই কবির। বরং, তার মা-র ছিলো। এই এক ছেলে নিয়ে হৈমন্তী বিধবা হন। পনরো বছর আগে—তাঁর বয়েস যখন আটত্রিশ। অনেক দিন পর্য্যন্ত এমন মনে হয়েছিলো যে তাঁর কোনো সন্তান হবে না। সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিলো। এমন সময়, তিরিশের কাছাকাছি এসে, আকস্মিক, আশাতীত, তাঁর প্রথম মাতৃত্ব। এই প্রথম, এই শেষ। মিহির! আর সেই সময় থেকে, তার জন্ম থেকে এই দুই জীবন পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য জড়িত: এর মূল ওর মধ্যে, একের প্রাণের উৎস অন্যের হৃৎকেন্দ্রে—অচৈতন্যে, অন্ধকারে। বাবা

তার জীবনে একটা ব্যক্তিগত সত্য হ'য়ে উঠতে পারার আগেই তিনি মারা গেলেন। কেবল মা নিয়ে তার জীবন। নিঃশ্বাসের মত তা সহজ, চিরন্তন—তা টের পাওয়া যায় না। তা নিয়ে ভাবতে হয় না। হৈমন্তী তাঁর ছেলের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছেন, লালন করেছেন: পল্লবিত, উন্মীলিত করে' তুলেছেন—তাঁর সমস্ত প্রাণ দিয়ে, প্রতি মুহূর্ত্তে, নিঃশেষে। স্বতঃস্ফূর্ত্ত, নিরবচ্ছিন্ন স্রোত, বাতাসের মত সহজ—তা টের পাওয়া যায় না।

দু'জনার মধ্যে নিবিড় নিষ্ঠুর ভালোবাসা। মিহির পরিপূর্ণ তার মা-র মধ্যেই। যেন তার মা-র শরীর থেকে নিঃসৃত একটি আবহাওয়া তাকে ঘিরে রেখেছিলো নিটোল সোনালি শান্তিতে। সেই শান্তিতে সে তৃপ্ত। হৈমন্তী তাকে দিয়েছেন অবসর—নিজের জীবন নিয়ে একা থাকতে। বিরল, অমূল্য উপহার। তাকে কিছু করতে হয় না। জীবনের যে-দিকটা ব্যবসাদারি, তার ভার হৈমন্তীর। তিনিই কথা বলেন বাড়িওয়ালা থেকে আরম্ভ করে' জমাদার পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গে। খরচ করেন, গুণে নেন ফেরত পয়সা, রাখেন হিসেব। হিসেব—মিহিরের জীবনের চরম বিতৃষ্ণা, যে-কোনোরকমের অঙ্ক দেখলেই সে ঈষৎ অসুস্থ বোধ করে। হৈমন্তীর প্রখর সাংসারিক জ্ঞান—পরিমিত আয় থেকে তিনি নিঙড়ে বার করেন যতটা আরাম সম্ভব, যতটা স্বাচ্ছন্দ্য। মিহির আরামের জীব। তার খাওয়া, তার শোয়া, তার পোষাক—

কোথাও কোনো-কিছুর এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটলে সে অশান্তি বোধ করে। রান্না করতে হয় মৃণ্ময়ীকে, ঘর-বাড়ি তকতকে-ঝকঝকে রাখতে হয়, জামা-কাপড় কাচতে হয় দরকার হ'লে, যখন আর-কিছু নেই কোনো-না-কোনো সেলাই করবার থাকেই। সময়ের চাপ তাঁকে অনুভব করতে হ'তো না—যথেষ্ট কাজ, দিন ভরে' রাখবার পক্ষে, জীবন ভরে' রাখবার পক্ষে যথেষ্ট কাজ।

আর মিহির ভালোবাসতো এই আরাম, শরীরের এই স্বাচ্ছন্দ্য। কোনোরকম শারীরিক অসুবিধে হ'লে সে বিরক্ত হ'তো: একদিন আহারের উপকরণে একটু কমতি হ'লে, কোনো বিকেলে চা খেতে একটু দেরি হ'লে সে মেজাজ ঠিক রাখতে পারতো না। শরীরকে ভুলে' থাকবার জন্যই তাকে সুখে রাখতে হয়। শরীর যেন বাধা দিতে না আসে তার আশ্চর্য্য সব চিন্তায়। তার কবিতা লেখায়।

"এমনি করে' যদি সমস্ত জীবন কাটতো! তা-ই কাটবে—অনেকদিন পর্য্যন্ত মিহির তা-ই জানতো। কিছু সময় কাটে, মানুষের বয়েস বাড়ে। বয়েস বাড়ে, মানুষের শরীর ভেঙে পড়ে। কী ভয়ানক! কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর অন্যায়।

অবিশ্যি তার মা-কে বুড়ো দেখায় না। মা-কে কখনো সে বুড়ো বলে' ভাবতে পারে না। মা যদি কখনো বলেন, 'এই বুড়ো বয়েসে—' কথাটা শুনে অসহ্য রাগ হয়। মূঢ়তা—নিজেকে বুড়ো বলে' ভাবা। কী যেন—তার মনে হ'তো, তার মা কখনো

বুড়ো হবেন না। ঘাড়ের কাছে ছাটা তাঁর ঘন কোঁকড়া চুল সাদা হ'য়ে আসছে, তা সত্যি ; দুটো একটা দাঁত পড়েছে, চোখের নিচের পাতা কুঁকড়ে আসছে। তা সত্যি। কিন্তু কী সুন্দর এখনো তিনি দেখতে। মসৃণ শুভ্র ঘাড়, শুভ্র নিটোল হাতের কব্জি—ষোলো বছরের মেয়ের মত। সাদায় আর কালোর মেশানো চুলে আলো আর ছায়া। সত্যি, ষোলো বছরের মেয়ের মতই তাঁর মুখের লাবণ্য। কেন মিছিমিছি এ-কথা ভাবতে যাওয়া যে বুড়ো হয়েছি? বুড়ো—কথাটা শুনলেই গা-টা কী-রকম শিউরে ওঠে না! সেই বুড়ো তার মা কখনো হবেন? অসম্ভব।

তবু—ছোট্ট একটা কথা লুকোনো দীর্ঘশ্বাসের মত মাঝে-মাঝে শোনা যেতে লাগলো। আর পারিনে, আর পারিনে। আর মিহিরের রক্তের স্রোতে যেন তা বরফের কুচি ছিটিয়ে দিয়ে গেলো—সেই ছোট্ট সূক্ষ্ম দীর্ঘশ্বাস : আর পারিনে, আর পারিনে। এক-একদিন হঠাৎ তার চোখে পড়তো লাল উনুনের ধারে বসে' তার মা রেঁধে যাচ্ছেন—কালো হ'য়ে উঠেছে তাঁর মুখ। আর হঠাৎ তার সমস্ত রক্ত যেন জমে' হিম হ'য়ে যেতো। কোনো-কোনো রাত্রে পাশের ঘর থেকে মা-র অস্ফুট গোঙানির শব্দ আসতো তার কানে। আর যে-রাত্রিকে সে প্রিয়ার মত ভালোবাসে তা বিষ হ'য়ে উঠতো। নিজেকে তার মনে হ'তো যেন অপরাধী—আর

সেই মনে হওয়াকে সে ঘৃণা করতো। তার অপরাধ কোথায়? সে কি খাবে না? সে কি বাঁচবে না?

কিন্তু সেই ছোট্ট চাপা আওয়াজ কিছুতেই মিলোচ্ছে না: আর পারিনে, আর পারিনে! তা তার শান্তির সময়েও হানা দিতে আরম্ভ করলো। কখনো-কখনো তা তার সমস্ত খাওয়ার আনন্দ কেড়ে নিতো—যখন সে দেখতো তার মা-র আগুনের আঁচে শুকনো একাগ্র মুখ। কুশ্রীতা সে সইতে পারে না; কেন তার মা সব সময় সুন্দর হ'তে পারেন না, আসলে তিনি যেমন? যে-জিনিস খেতে ভালো, তা তৈরি করতে এত কষ্ট কেন? কী অবিচার। নিজের দেশের উপর তার রাগ হ'তো, এখানকার রান্নার যন্ত্রপাতি এমন বর্ব্বর বলে'। আধুনিক কল-কব্জাওয়ালা রান্নাঘর হ'লে...না, তাকে খামকা এ-রকম অপরাধী ক'রে' তোলবার অধিকার কারো নেই।

যা-ই হোক, কথাটাকে সে মনের মধ্যে চাপা দেবার চেষ্টা করলো। কাটলো সময়। অন্যের সম্বন্ধে মিহিরের যতখানি বিবেচনা, এমন সাধারণত দেখা যায় না। বাড়ির চাকরকে কোনো বাড়তি কাজের কথা বলতে সে কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠতো। কেবল তার মা-র পরিশ্রম সম্বন্ধেই যেন কোনো দ্বিধা ছিলো না তার মনে। মা-র কাজ করাটাই যেন স্বাভাবিক, সুন্দর। কেননা আমরা শুধু তার হাত থেকেই সেবা নিতে পারি, এবং নিতে চাই, যাকে

ভালোবাসি। এবং যে ভালোবাসে বলে' জানি। মন যার প্রতি উদাসীন, তার সুবিধার লেশমাত্র হানিতে চঞ্চল হ'য়ে উঠি, কিন্তু ভালোবাসি যাকে, তাকে খাটিয়ে মারতে বাধে না। ভালোবাসার রীতি বিচিত্র।

কিন্তু হৈমন্তীর শরীর সত্যি যেন আর পেরে উঠছে না। প্রায়ই তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়ছেন। তবু চা আসছে ঠিক সময়ে। মাছের রান্নার বৈচিত্র্য খর্ব্ব হচ্ছে না। তবু এক-এক সকাল-বেলায়, বালতির পর বালতি জল ঢেলে ঘরের মেঝে তিনি ঝকঝকে করে' তুলছেন। আর মিহিরের বুকের ভিতর দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা, সাদা কাঁপুনি নেমে যায়—তাঁকে উব-হাঁটু হ'য়ে বসে' ঘর সাফ করতে দেখে।

কথাটা কী করে' প্রথম ওঠে মিহিরের মনে নেই। কিন্তু একদিন সেটা উচ্চারিত হ'লো। আর সেটা রয়ে' গেলো—বন্দুক ছোঁড়বার পর বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধের মত। তা রয়ে' গেলো, বাতাসে একটা ভারি অনুভূতি, তা কিছুতেই সরে' যাবে না। মিহিরের মনে হ'তে লাগলো যেন কোনো শত্রু অন্যায় কৌশলে তাকে কোণ-ঠাসা করেছে। বেরোবার পথ নেই। তার মনের মধ্যে একটা অন্ধ চাপা রাগ গুমরে মরতে লাগলো।

তার জীবনে স্ত্রীর কোনো প্রয়োজন নেই। পুরুষ যে-সব কারণে বিয়ে করে তার একটাও এখন তার পক্ষে খাটে না। এ-পর্য্যন্ত সে

বিয়ের কথা কখনো ভাবেই নি। তা মনে হয়েছে একেবারে অবান্তর, নিছক বাহুল্য। অথচ তার জীবনে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন মর্ম্মান্তিক। তাকে ভালোবাসতে, তার সেবা করতে তার শরীরের সম্পূর্ণ আরাম সৃষ্টি করতে। মা-ই তো আছে—আর এসব ব্যাপারে মা-র মত আর কে? [যে মা ভালোবাসে, তার মত অপরূপ স্ত্রীত্ব কোন্ স্ত্রীর? এমন কোমল, এমন নীরব, আত্ম-সমর্পণে এমন নিঃশেষিত? ক্রীতদাসীর মত তার নীরব, অবিরল সেবা। ছেলের খাওয়ার কাছে মা যেমন চুপ করে' বসে' থাকে, আত্ম-বিস্মৃত, ভালোবাসায় মগ্ন, এমন পারবে কোন্ স্ত্রী? স্ত্রী অনেক-কিছু চায়, মা কিছু চায় না। মা কিছু চায় না: কেবল হ'তে দেয়, কেবল ফুটিয়ে তোলে। স্ত্রী ভালোবাসা চায়, ভালোবাসার ক্ষুধায় স্বামীকে সে ছিঁড়ে ফেলতে পারে; মা-কে ভালোবাসবার পর্য্যন্ত দরকার করে না। স্ত্রীর কাছে অনেক দাবির, অনেক কথার, অনেক সংঘাতের ক্ষয়: মা-র কাছে শান্ত নীরব সম্পূর্ণ অখণ্ডতা।]

অথচ বিয়ে সম্বন্ধে তার মনে একটা স্বপ্নও আছে। সে কবি: সে প্রেম বোঝে, সে প্রেম চায়। সেই রহস্য আর আতঙ্ক আর উন্মাদনা! মেঘে-ঢাকা জ্যোছনায় অস্পষ্ট উতরোল ভয়াল সমুদ্র। অনেক রাত্রে শূন্য মাঠের উপর দিয়ে ভেসে-আসা হঠাৎ দক্ষিণে হাওয়া—চোখে যাতে জল এসে পড়ে। অনেক ছবি সে দেখেছে

—চোখে দেখেছে, মনের মধ্যে নতুন করে' সৃষ্টি করে' দেখেছে। অনেক অনুভূতি এসেছে তার জীবনে—প্রথমে তার শরীরের জীবনে, তারপর তার ভাবনায় নতুন হ'য়ে, অপরূপ হ'য়ে। সেই সব—সব জড়িয়ে, মিশিয়ে, একত্র করে' চরম করে' সে চায় সেই মেয়েতে, যাকে সে চাইবে, যাকে সে চাইবে রক্তের সমুদ্রের সমস্ত উতরোল হিংস্রতা দিয়ে।

আর তাকেই কি শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করতে হবে যে-হেতু রান্না করবার জন্যে একজন লোক দরকার? যেহেতু সকালে তার ঘুম ভাঙবার আগে চা তৈরি করবার জন্যে কেউ না থাকলে চলে না? ভাগ্যের বিদ্রূপ! আর কী নিষ্ঠুর বিদ্রূপ। খুব রুচিসঙ্গতও নয়।

কিন্তু তা-ই যে। তার মা তা-ই চান। আর সত্যি কথাটা যদি বলতেই হয়, সেও তা-ই চায়। তার পরিচর্য্যার জন্য একজন স্ত্রীলোক দরকার। তা না হ'লে সে বাঁচবে না। স্ত্রীলোক ছাড়া সে বাঁচতে পারে না—যা-ই বলো আর যা-ই করো। তার মা-ই তাকে এ-অভ্যাস করিয়েছেন। আর এখন তিনি বলছেন আর পারিনে। আর পারিনে! আর পারিনে! কী অন্যায়! মিহিরের মনে হ'তে লাগলো যেন কেউ তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে। কেউ যেন কথা দিয়ে কথা রাখেনি। এ রকম তো কথা ছিলো না—এ আবার কী? তার নিছক শারীরিক কয়েকটা

আরামের জন্যেই কি এখন তাকে বিয়ে করতে হবে? কী অপমান, কী লজ্জা কিন্তু এ-কথা সে তো জোর করে' বলতে পারে না—না, দূর হ! দূর হ! আমি আমার নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারবো। কেননা সে তা পারে না। সেখানে তার চলে না স্ত্রীলোক না হ'লে। ভাড়াটে চাকরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করবার কথা ভাবতে পারে না সে। এদিকে সময় কাটছে, মা-র বয়েস বাড়ছে। এমনি চিরকাল চলতে পারে না। মিহির আর ভাবতে পারে না; সে চোখ বুজে ফেলে, যেন কোনো অজ্ঞাত আশঙ্কাকে এড়াবার জন্য। কী অন্যায়। কী নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর অন্যায়! তার বুকের ভিতরে একটা অন্ধ নির্বোধ চাপা রাগ প্রতি মুহূর্তে ফেটে পড়তে চাইছে।

আর মিহির নিজের মধ্যে ছটফট করতে লাগলো—কোণ-ঠাসা কোনো জন্তুর মত। না—এ ভাবা যায় না, এ হ'তেই পারে না। এ তার দুর্ব্বলতার উপর অন্যায় সুযোগ নেয়া—নিছক অত্যাচার তার উপর। আর তবু—মা-র সেই ছোট্ট, সূক্ষ্ম দীর্ঘশ্বাস-স্বর তাকে জ্বালা দিতে লাগলো, আর মার চোখের নিচে গভীর হ'য়ে পড়তে লাগলো রেখা। আর প্রায়ই তাঁকে কেমন ম্লান দেখাতো—যেন শরীরের রক্ত শুকিয়ে আসছে। আর ছেলের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথায় বিস্ফারিত হ'তো, সেই মুখের দিকে তাকিয়ে।

শেষটায় একদিন সে বললে, 'আমি এখন বিয়ে করলে তুমি সত্যি খুসি হও ?

হৈমন্তী বললেন : 'সত্যি খুসি হই।'

আর এমনি করেই' বিয়ে হ'লো। উত্তাপহীন, আনন্দহীন। নিয়তির মত অন্ধ, নিয়তির মত নিষ্ঠুর। কোনো অদৃশ্য অন্ধ শক্তি তাকে আঁকড়ে ধরেছে—তার সমস্ত মানুষ-শক্তি, পুরুষ-শক্তি সেখানে ব্যর্থ। সে কিছু করতে পারে না। আচ্ছা, হোক তবে। হয়-তো এতে সত্যি-সত্যি এতটা কিছু এসে যায় না, যতটা সে মনে করছে। তার বুক একবারও একটু কেঁপে উঠলো না—কোনো ভয়ে কি কোনো সুখে কি কোনো প্রত্যাশায়। মনকে সে পাথর করে' তুললে। শুধু পাথরের দেয়ালে অবরুদ্ধ সেই অন্ধ চাপা রাগ।

যা-কিছু করবার হৈমন্তীই করলেন। মৃণাল তাঁর খোঁজেই ছিলো। তাদের পরিবারের সঙ্গে ছিলো তাঁর জানাশোনা। মেয়েটি কালো, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। লেখাপড়া শেখেনি, কিন্তু গৃহকর্ম্মে অসামান্য নৈপুণ্য। আঠারো থেকে উনিশের মাঝামাঝি বয়েস। ঠিক যে-রকম মেয়ে হৈমন্তী চান, যার হাতে তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ছেলেকে দিয়ে যেতে পারবেন। অনেকদিন থেকেই তাঁর মন পড়েছিলো এ-মেয়ের উপর। তিনি দেরি করলেন না।

সূর্য্যমুখী

'মেয়েটিকে একবার গিয়ে দেখে আসবি, মিহির ?'

'কী হবে দেখে। ঢের তো সময় পাবো দেখবার।'

তারপর, বিবাহ-লগ্নে যখন কন্যার মুখের দিকে তার তাকাবার কথা, সে দৃষ্টিহীন চোখে সামনের শূন্যের মধ্যে তাকিয়ে রইলো —কিছু দেখলে না, কিছু বুঝলে না। আর হঠাৎ সেই অন্ধ চাপা রাগ তার গলার কাছে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফেটে পড়লো—যেন গলা টিপে তাকে মেরে ফেলবে।

২

হৈমন্তী আর মৃণালে চমৎকার মিললো—কবিতার দুই চরণের মত। বাড়ির মধ্যে প্রায়ই এরা দু'জন একসঙ্গে। হৈমন্তী তৈরি করছেন তাঁর প্রতিনিধিকে। মিহিরের সমস্ত শারীরিক অভ্যাস তার জানা চাই, তার শরীরের অসংখ্য তুচ্ছ প্রয়োজন—যে-সম্বন্ধে মিহির নিজে ভালো করে' সচেতনও নয়, তাদের পরিতৃপ্তি এমনই নিয়মিত, নির্ভুল, যন্ত্রের মত মসৃণ। তার জন্যে কখনো চেষ্টা করতে হয় না: যেন অভাবই তার তৃপ্তিকে সৃষ্টি করে, গর্ভলীন শিশুর নিশ্চেতন জীবনের মত। প্রতিদিনের জীবনে প্রতি মুহূর্তে কত জিনিস যে আমাদের শরীরের দরকার তা আমরা কখনো বুঝতেও পারিনে—যতক্ষণ কাছে থাকে কোনো স্ত্রীলোক, কোনো স্বেচ্ছা-ক্রীতদাসী, নিজেকে যে অবিশ্রান্ত ঝরিয়ে দেয়, নরম পশলার পর পশলায়; নীরবে, গোপনে যে ঢেউ খেলিয়ে যায় প্রিয় পুরুষের জীবনের উপর দিয়ে, তার রক্তের ভিতর দিয়ে—অন্ধকার, উষ্ণ স্রোতে।

হৈমন্তী মৃণালকে কাছে টেনে নিলেন, তাকে জড়িয়ে ধরলেন নিজের জীবন দিয়ে। আর এই দুই স্ত্রীলোকের মধ্যে এক অদ্ভুত ভাষাহীন বাণী-বিনিময়; তারা যেন অনেক আগেই পরস্পরকে বুঝে ফেলেছে। ডিমের খোলসের মধ্যে অজাত পাখির মত তারা আত্ম-সম্পূর্ণ—সেই তাদের মনোহীন, শারীর স্ত্রী-জগতে। কেননা

মেয়েরা শুধু শরীরই বোঝে, শুধু শরীরকেই ভালোবাসে। তাদের সঙ্গে আমাদের শুধু শরীরের বিদ্যুৎ-সংস্পর্শ; অন্য যেদিক দিয়েই আমরা তাদের সঙ্গে মিলতে যাই, সেটা খানিকটা গায়ে-পড়া, খানিকটা মন-গড়া ব্যাপার। মিহিরের মনের জীবন—তার ভাবনার, কল্পনার, কবিতার জীবন—তার উপর হৈমন্তীর এতটুকু টান নেই, কোনো কৌতূহল নেই তা নিয়ে। সে-জীবন যদি মূল পর্যন্ত শুকিয়ে মরে' যায়, তিনি তা জানবেন না; যদি পল্লবিত হয়ে ওঠে ইন্দ্রধনু-ঐশ্বর্যে তবু তিনি কিছু বুঝবেন না। তাঁর ছেলে ভালো কবিতা লিখতে পারছে কি না পারছে তা নিয়ে কোনো ভাবনা নেই তাঁর। তাঁর চোখে ছেলের কবিতার যদি কিছু অর্থ থাকে তা শুধু এই যে একটা-কিছু নিয়ে সময় তো কাটাতে হবে, আর এতে যদি ওর মন ভালো থাকে এ-ই বা মন্দ কী? মিহিরের যেটা আসল জীবন, যেখানে সে কবি, সে শিল্পী, সে সীমাহীন—অনুভবে আন্দোলনে ব্যাকুলতায় সেই তার অস্পষ্ট ছায়াময় সমুদ্র-জীবন—সেখানে মায়ের হাত থেকে সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; সেখানে সে চিরন্তন নিঃসঙ্গ; সেখানে কোনো মাতৃমাংস থেকে তার সৃষ্টি হয়নি—সেখানে সে আত্মজ, আত্মসম্পূর্ণ, চরম। হৈমন্তীর এমন ক্ষমতা নেই সেখানে মুহূর্তের জন্য একটু উঁকি দেন। সে-ইচ্ছাও নেই। শুধু ছেলের শরীরের জীবন নিয়েই তাঁর ভাবনা—দিন থেকে দিন, প্রতি মুহূর্তে নিজের হাতে যে-জীবনকে তিনি সৃষ্টি

করেছেন। সেখানেই তিনি ছেলেকে বোঝেন—নিজেকে দিয়ে ছেলেকে ভরে' তুলতে পারেন সেখানেই।

মৃণালকে তিনি দীক্ষিত করলেন সেই নারীর জীবনের রহস্যে। বেশি বলবার দরকার হ'লো না, সে প্রস্তুত হ'য়েই ছিলো। সে-ও তো মেয়ে। কী-রকম রান্না মিহিরের প্রিয়, মশারি কতটা উঁচু না হ'লে তার ঘুমের ব্যাঘাত হয়, চা সম্বন্ধে সে কী ভয়ানক খুঁৎখুঁতে—ইত্যাদি, ইত্যাদি, আর তার সঙ্গে ব্যবহারের, ভঙ্গির অসংখ্য খুঁটিনাটি, যা বাদ দিলে সমস্তই অর্থহীন—একটু বিস্বাদ হ'য়ে ওঠে। শুধু করলেই চলে না, করবার রকমটা জানতে হয়—সেটাই আসল। সেখানে যদি কোনোরকমে একটু সুর কাটে, সব যায় নষ্ট হ'য়ে। আর মিহিরের কাছে অবিশ্যি তার মা-ই হচ্ছে মেয়েলিতম মেয়েত্ব: পৃথিবীর অন্য কোনো মেয়ের সাধ্য নেই সেই তৃপ্তি, সেই শান্তি তাকে দিতে পারে। মৃণাল সেটা বুঝতে পারলে তার প্রবৃত্তি দিয়ে। তাই সে হৈমন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো সম্ভ্রমের, পূজার দৃষ্টিতে। নিবিড়ভাবে সে আসক্ত হ'য়ে পড়লো তাঁর প্রতি—সারাদিন সে আছে তাঁর পিছনে, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে। সব সময় যে কোনো কথা হ'তো তা নয়, দু'জনের মধ্যে নীরবতার পরিপূর্ণতা। আর কথা যখন হ'তো—সেই সব তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে, যা নিয়ে মেয়েরাই কথা কইতে পারে। হৈমন্তীর জীবন সে নিজের করে'

নিলে। কিছুদিনের মধ্যেই মিহির টের পেলো যে তার জীবনের হাত বদলি হচ্ছে। তার প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের নেপথ্যে রয়েছে মৃণাল। খেতে, বসতে, ঘুমোতে, কাপড় ছাড়তে সে হোঁচট খেয়ে পড়ছে মৃণালের উপর। মা যেন খানিকটা দূরে সরে' গেছেন। মাকেও সে যেন দেখতে পাচ্ছে মৃণালের ভিতর দিয়ে। মা তো সব সময় তাকে নিয়েই ব্যস্ত, মা-র জীবনের খানিকটা যেন মিশে গেছে তার সঙ্গে। নিজেকে তিনি যেন দিতে চাচ্ছেন এই মেয়েরই ভিতর দিয়ে। কিন্তু এ তো তিনি নন্। মিহির একে চায় না। তার রাগ হ'লো, অভিযোগ জমে' উঠলো মনে। তার মনে হ'লো, মৃণাল যেন মা-কে কেড়ে নিচ্ছে তার কাছ থেকে: নিজেকে সে কেবলই ছড়িয়ে দিচ্ছে তার স্ত্রীত্বের গর্ব্বে, নিজেকে দিয়ে সব ভরে' তুলছে—তারই জন্য যেন সে মা-কে হারাতে বসেছে। অসহ্য—এই আত্ম-প্ররোচিত উদ্ধত স্ত্রীত্ব।

আসলে কিন্তু মৃণাল শান্ত, অত্যন্ত শান্ত, কানায়-কানায় ভরা দীঘির কালো জলের মত স্তব্ধ। কথা সে কম বলে; বাড়ির মধ্যে নানা কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়—নীরব, ছায়ামগ্ন। বিড়ালের মত নিঃশব্দ তার চলাফেরা। হৈমন্তীর প্রতি তার আনুগত্য অনেকটা যেন পোষা বিড়ালের অস্ফুট, রেশমি আসক্তির মত: তার সমস্ত শরীরে পোষ-মানা পশুর শান্ত, নরম হাব-ভাব। বড়-বড় উজ্জ্বল তার চোখ—রাত্রির অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মত। সব

সময় সে যেন সম্পূর্ণ দৃষ্টি মেলে' তাকিয়ে আছে। কেমন একটু অস্বস্তিকর—তার সেই স্তব্ধ, উজ্জ্বল দৃষ্টি। মিহির কখনো ভালো করে' তার দিকে তাকালো না। সে যখন ঘরে আসে মিহিরের চোখ বইয়ের উপর। সে যখন দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় মিহির চোখ না-তুলে বলে—'কী ?' তার দিকে না-তাকাবার চেষ্টায় মিহির নিজেকে প্রায় অসুস্থ করে' তুললো। তবু এক-এক সময়, হঠাৎ তার চোখ মৃণালের চোখের উপর গিয়ে পড়তো—বিস্ফারিত, উন্মীলিত সেই চোখ। মৃণাল স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো—সে-ই নিতো চোখ নামিয়ে। আর তার স্ত্রীর শুধু এইটুকুই রইলো তার মনে—উজ্জ্বল, স্তব্ধ সেই চোখ, রাত্রির অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মত।

৬

মৃণাল লেখাপড়া শেখেনি, ভালোবাসতে শিখেছিলো। তার শান্ত, সুদূর, রেশমি ধরণে। বিড়াল যেমন করে' পায়ের কাছে জড়ো-সড়ো হ'য়ে বসে, যেমন করে' রেশমি ভঙ্গিতে পায়ের নিচে ত'র উষ্ণ শরীর এলিয়ে দেয়। এর বেশি কি এর চাইতে অন্যরকম কোনো ভালোবাসা সে ভাবতে পারতো না। তার স্বামীর মনে প্রেমের যে-কল্পনা—পৃথিবী থেকে স্বর্গের সীমা পর্য্যন্ত রঙিন নদীর মত প্রবাহিত সেই বিরল ইন্দ্রধনু, তা সে বুঝতো না। তার কথা কেউ তাকে বলেনি, সে জানতো না ও-রকম কিছু মানুষের জীবনে আছে। সে বই পড়েনি, কবিতা পড়েনি. শিশুকাল থেকে সে শুধু জেনেছে বেঁচে থাকবার কঠিন, নিষ্ঠুর প্রয়োজন। সে সময় পায়নি ভালোবাসা সম্বন্ধে মনের কোনো ধারণা সংগ্রহ করবার, কোনো কবির স্বপ্ন থেকে, শব্দের কোনো সর্প-সূক্ষ্ম জাদু থেকে। তার মন নগ্ন, শূন্য—কোনো ভাবনার সূর্য্যাস্ত-মেঘে তা বিলসিত নয়। সে শুধু জানতো ভালোবাসার অপ্রতিরোধ্য, নিষ্ঠুর প্রয়োজন—তার রক্তে, তার নিশ্চেতনতায়। বর্ব্বর নারীর মত দৃষ্টিহীন, প্রশ্নহীন, উত্তপ্ত তার আত্ম-সমর্পণ। তার স্বামীর কবি-খ্যাতি সে শোনেনি: তার স্বামী কী আর কী নয়, সে-সব ব্যাপারে তার প্রবৃত্তিগত উদাসীনতা। পুরুষ কিছু করবে, কিছু হবে এ তো জানা কথা—কিন্তু সেখানে তো, সেখানে তো স্ত্রীর সঙ্গে তার

মিলন নয়। সে আসবে তার স্ত্রীর কাছে দিনের কাজের পরে—রাত্রির অন্ধকারে, রাত্রির নীরবতায়: সে তাকে খুঁজবে রাত্রির সেই সঙ্গোপন, উত্তপ্ত অন্তঃপুরে, তাকে নেবে অনির্ব্বচনীয় নীরবতার সেই রাত্রিতে। সেই তার গহন, নির্জ্জন রাত্রি-সত্তা—সেখানে সে তার স্ত্রীর। স্ত্রী সেখানে ফুটে উঠবে পাপড়ির পর পাপড়িতে আশ্চর্য্য নামহীন কোনো ফুলের মত, সেই বিশাল, নির্জ্জন অন্ধকারে, প্রতিটি পাপড়ি প্রাণ-স্নাত, শরীরের বিরলতম, নিভৃততম সুরায় সিঞ্চিত।

তা-ই মৃণাল জানতো। এত কথা অবিশ্যি তার মনে হ'তো না, কিন্তু এ-ই সে অনুভব করতো: এরই জন্য নিজেরই অজ্ঞাতে, এই পরিপূর্ণতারই জন্য নিজের মধ্যে সে নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। যে-সূর্য্য আঙুরকে ভরে' তোলে, সে তাকে জানে না; মৃণালও জানতো না কোন্ অদৃশ্য, ভীষণ শক্তি রয়েছে তার উষ্ণ-স্পন্দমান, সুরা-সঞ্চারমান বক্ষের নেপথ্যে। জাগ্রতভাবে সে তার শরীর সম্বন্ধে সচেতন ছিলো না; কিন্তু, কী যেন, কোনো অস্পষ্ট, অদ্ভুতভাবে সে যেন তাকে জানতো। তার শরীরের সঙ্গে তার জীবনের এক ছন্দোময় প্রবাহ। অদৃশ্য, অন্ধকার স্রোতের মত তার শরীর-চেতনা। তার শরীর—তা-ই তার মহান উপহার, তার যজ্ঞের উৎসর্গ, তা-ই নিয়ে সে এসেছিলো: আর-কিছু তার ছিলো না। আর আশ্চর্য্য সে-শরীর, বসন্তের লতার মত,

জ্বলন্ত দীপশিখার মত। অগ্নিময় তার শরীর, যৌবনময়: কোনো গোপন, হিংস্র আগুনে আঙুলের ডগা পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত। গোপন, লুকোনো আগুন, তার রক্তের মধ্যে কোনো অন্ধকার ঐশ্বর্য্য: তার চামড়ায় পড়েছে তারই ছায়া। সেই গোপন আগুনই তো তাকে কালো করেছে, শূন্য দিগন্তে বিশাল রাত্রির মত সেই রহস্য: প্রাণের উত্তাপে সে কালো, প্রাণের লাবণ্যে আভাময়। দীর্ঘ, সবল তার বাহু; তার নাসারন্ধ্রে প্রখর অনুভবশীলতা: তার উর্দ্ধচূড় বক্ষের নির্ভীক বঙ্কিমা। কিন্তু এই সমস্ত শক্তি নেপথ্যে রয়েছে, নিহিত রয়েছে—সে ভালো করে' তা জানেও না। এই সমস্ত শক্তি অপেক্ষা করছে কোনো পুরুষের, কোনো স্বামীর। সেই স্বামীর রাত্রিতে তা ফুটে উঠবে, তারা হ'য়ে উঠবে। জ্বলন্ত, চিরন্তন তারা। এখনো মৃণাল রয়েছে শান্তিতে শিথিল, আচ্ছাদনে অস্পষ্ট, পোষ-মানা পশুর মত নরম।

কিন্তু রাত্রি বন্ধ্যা, রাত্রি পাথরের মত বোবা। ফুল পড়ে' রইলো, সমস্ত রাত্রি ভরে', ফুটে ওঠবার অপেক্ষায়। আশ্চর্য্য, নামহীন সেই ফুল! কিন্তু অন্ধকার ফেটে পড়লো না গোপন সূর্য্যে, অন্ধকার কথা কয়ে' উঠলো না। পাথরের মত বোবা অন্ধকার, পাথরের দেয়ালের গায়ে রাত্রি নিষ্পেষিত। মৃণাল চুপ করে' রইলো। কিছু করলে না, কিছু ভাবলে না। মনে-মনে তর্ক করলে না, দীর্ঘশ্বাস ফেললে না, ভাগ্যকে একবার

দোষ দিলে না। মেনে নিলে। স্বামীকে মেনে নিলে স্বামী ব'লেই; কোনো অদ্ভুতভাবে তাকে বিশ্বাস করলে পর্য্যন্ত। মেয়েমানুষের একবার যখন বিয়ে হ'য়ে যায়, সমস্ত তর্কের শেষ মীমাংসা তো সেখানেই। তার উপর আর-কোনা কথা চলে না। তারপর কেবল মেনে নিতে হয়, কেবল বিশ্বাস করতে হয়।

কেননা মিহির তার সমস্ত মনকে পাথর করে' তুলেছিলো। খানিকটা চেষ্টা করে', ইচ্ছার সাহায্যে। সে মনে-মনে তার রাগকে পুষেছিলো—যেন খানিকটা আদর করে', ভালোবেসে। সে-ই তো তার ইচ্ছার নিশান, এই রাগ। তার নিজত্বের খানিকটা ভাঙাচোরা, বিকৃত ব্যঞ্জনা। হ্যাঁ, এই রাগকে সে ভালোবাসতো। কিন্তু তাকে সে গোপন করতো পরম চেষ্টায়, প্রকাশ্যে কখনো উড়তে দিতো না সেই নিশানকে। মা-কে সে কিছু বুঝতে দেবে না। এই তার প্রতিশোধ মা-র উপর, পরম প্রতিশোধ এইজন্যে যে তিনি তা জানবেন্ না। তিনি যা চেয়েছিলেন, তা-ই হয়েছে। মাতৃ-ইচ্ছার অন্ধতায় আর-কিছু তিনি ভাবেন নি। বেশ, এইবার ছেলের পালা। এইবার সে নিজের মনে উপভোগ করবে তার ছোটখাটো ঠাট্টা। সে ঠকাবে, ঠকাবে—প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্তে ঠকাবে, তিনি তা জানবেন না।

স্ত্রীর প্রতি তার প্রথম প্রতিক্রিয়া যেন খানিকটা শারীরিক বিকর্ষণ গোছের। যেমন কোনো-কোনো লোক দেখা হওয়া মাত্র কাছে টানে, ঠিক তেমনি, মৃণাল যেন তাকে দূরে টানলে। তার একমাত্র ইচ্ছা হ'লো দূরে যেতে, দূরে সরে' যেতে। আর এই ভাব কাটিয়ে ওঠবার কোনোরকম চেষ্টা সে করলে না; কখনো মৃণালের দিকে চেয়ে দেখলে না, তাকে দেখলে না। সে যেন খানিকটা এই রকমই ভেবে রেখেছিলো, এটাই আশা করেছিলো। সে দূরে সরে' রইলো—ঠাণ্ডা, সাদা বিচ্ছিন্নতায়। সত্যি, এ-মেয়ের সঙ্গে কোথায় তার এতটুকু মিল? সে অন্য-এক জগতের, অন্য-এক গ্রহের। তার জীবনের আঁকাবাঁকা রাস্তা কোনো-একটা মোড়েও এর জীবনকে কেটে যায়নি। সে কবি, সে স্বপ্নবিলাসী: তার মনের ভাবনার মেঘে-মেঘে ছন্দের সোনার রঙ্ ধরে। সে যা ভাবে, সে যা অনুভব করে—আ, সেই সব ক্ষণিক, পলাতক আলোর টুকরো—সে কথায় ধরে' রাখতে পারে তার কতটুকুই বা। কল্পনার সেই রহস্যময়, অপরিসীম আকাশ—সেখানে তার মন পাখা মেলে দেয়, পাখা মেলে দেয়, উড়ে চলে' যায় দিগন্ত থেকে দিগন্তে,—দুরাশা থেকে দুরাশায়। তার মধ্যে এই মেয়েকে সে দেখবে কেমন করে'? কত বড় আলো তার চোখের সামনে, অনেক কাছের জিনিস তার চোখে পড়ে না। দেখতে না-পাওয়াই হয়-তো দরকার। আর

যদি সে-সব জিনিসের মধ্যে কোনো স্ত্রী পড়ে' যায়···তা হ'লে কী আর করা।

অথচ স্ত্রীলোকের মোহ সম্বন্ধে মিহিরের মন একটু বিশেষ রকম দুর্ব্বল—যেমন সব কবিরই হ'য়ে থাকে। 'আমার প্রাণের 'পরে চলে' গেলো কে বসন্তের বাতাসটুকুর মত?' কে? কী হবে খোঁজ নিয়ে? কী হবে জেনে? তুমি যে-ই হও, তুমি বয়ে' যাও আমার প্রাণের উপর দিয়ে বসন্তের বাতাসের মত। আর-কিছু আমি চাইনে। চোখের চকিত আলো কি ভুরুর একটু টান কি বাহুর অলস কোনো ভঙ্গি—কি দূর থেকে জানলায় দেখা ছবি কি হঠাৎ হাতের উপর একটু রেশম-স্পর্শ—যে-কোনা, যে-কোনো জিনিস, যাকে ঘিরে আমার কথা বুনে যাবে তার রঙিন জাল। হোক্ তা মুহূর্ত্তের, আমার এই কথাও তো মুহূর্ত্তের ফুল। তুমি বয়ে' যাও বসন্তের বাতাসের মত ফুল ফুটিয়ে দিয়ে, ফুল ছিটিয়ে দিয়ে। আর-কিছু আমি চাইনে।

এই হচ্ছে সব কবির মনের কথা, চিরকালের কথা। স্ত্রী-জাতির তারাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় উপাসক; কিন্তু সেই উপাসনায় কতখানি গর্ব্ব, কতখানি স্বার্থপরতা তা বুঝতে পারলে কোনা মেয়ে তার কবি-প্রেমিককে কাছে আসতে দিতো না। কবির হৃদয়ের মত এমন প্রবঞ্চনা আর-কিছুই করে না। সহজে সেখানে রঙ ধরে, সহজে মুছে যায়: রেখে যায় সময়ের সমুদ্রে টলোমলো

একগুচ্ছ ক্ষণিকা। সেই রঙটাই তারা চায়, ভালোবাসতে চায় না।

না—এ-ও ঠিক বলা হ'লো না: ভালোবাসতেও চায় বই কি, ভালোবাসতেও পারে। কিন্তু আগে রঙ্ ধরা চাই। যে-রঙ্ ঝলসে ওঠে কবিতার কূলে-কূলে, তাই জমে'-জমে' একদিন হয়-তো গড়ে' তোলে প্রেমের আশ্চর্য্য উজ্জ্বল মণি। কিন্তু যেখানে সে-রঙ্ নেই, যেখানে হঠাৎ বসন্তের হাওয়া মনে এসে লাগে না, সেখানে তাদের উদাসীনতার, অন্ধতার সীমা নেই: সেখানে তারা দেখতে পায় না।

এমনি মিহিরের। তার মনের মধ্যে কোনোখানে ছিলো ভালোবাসার বিশাল, দুরন্ত বাসনা—হ্যাঁ, ভালোবাসাই তো—তা ছাড়া আর কী নাম দেবো? এবং এটা সে জানতো যে তা সহজে হবার নয়। না, সহজ তা নয়। তাকে খুঁজে বেড়ানো যায় না, ইচ্ছার জোরে তাকে পাওয়া যায় না। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়—আদিম, গম্ভীর ধৈর্য্যে। তার জন্য প্রার্থনা করতে হয় সুদূর দেবতার কাছে। আর মিহির প্রার্থনা করতো—তার জীবনের নির্জ্জনতায়, তার কবিতার সেই রাত্রি-উৎসে। সে বিশ্বাস করতো একদিন সে পরিপূর্ণ হবেই। সে তা অনুভব করতো তার আত্মার গভীরতম স্তরে। সব সময় যেন তার মনে হ'তো—কোনোখানে, কোনো-এক মেয়ে অপেক্ষা করছে তার জন্য।

সূর্য্যমুখী

তার নাম সে জানে না, কিন্তু তাকে দেখলেই চিনতে পারবে। এখনো মাঝখানে রয়েছে অদৃষ্টের আড়াল: একদিন ছিঁড়ে যাবে সে-বাধা, মুহূর্তে জ্বলে' উঠবে সমস্ত আকাশ, কোনো সংশয় থাকবে না। এ না-হ'য়েই পারে না: সে যদি এমন করে' চাইতেই পারে, তা হ'লে হওয়াটা এমন কী আশ্চর্য্য। না, সেটা তেমন আশ্চর্য্য নয়; সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে সে এমন করে' চাইতে পারছে। কেননা এ-চাওয়াতে দুঃখ অনেক। কেবল চুপ করে' থাকতে হয়, নিজের নিভৃত আত্মায়। আর-কিছু করবার নেই। অনেক ছেড়ে দিতে হয়, অনেক হারাতে হয়। বিশ্বাসের প্রচণ্ড জোর দরকার। জীবনে ক্লান্তির, অবসাদের মুহূর্ত্ত আছে—সেগুলোকে কাটিয়ে উঠতে সত্যিকারের সাহস দরকার। এমন মুহূর্ত্তও হয়-তো আসে যখন মনে হয় ও-সব ফাঁকি, ও-সব কিছু নয়—তাকে পরাস্ত করবার জন্য খানিকটা সঞ্চিত শক্তি না হ'লে চলে না। আর সবার উপর, যা নিকট, যা প্রত্যক্ষ, যা সহজ—তাকে প্রতি মুহূর্তে ছেড়ে যেতে হয়, ছাড়িয়ে যেতে হয়। তবে যদি দেবতা দয়া করেন।

আর সেইজন্য মিহিরের কাছে মৃণাল নিতান্তই অবান্তর, অর্থহীন। কোনোরকম আমলে আনবার মতই নয় সে। সে এত বেশি প্রত্যক্ষ, এমন নিতান্তই কাছে! তার মধ্যে এতটুকু কোনো আড়াল নেই যার ফাঁকগুলো সে তারা দিয়ে ভরিয়ে তুলতে

পারে। তার মধ্যে নেই কোনো দিগন্ত-ইঙ্গিত, কোনো অদৃশ্য আকাশে বলাকার পাখা-ঝাপটানির শব্দ। উন্মোচন করো, আবরণ উন্মোচন করো—তোমার মুখ দেখতে দাও। এ-ই হচ্ছে পুরুষের প্রার্থনা, প্রতি পুরুষের আত্মায় নিহিত করিব। তোমার মুখ দেখতে দাও, হে রহস্যময়ী, তোমার ঘোমটা সরিয়ে নাও। সপ্ত-অবগুণ্ঠনবতী সেই দেবী—তার পূজায় পুরুষের আত্মা জ্বলে' ওঠে লাল শিখার মত, বীরের হাতে খড়্গের মত। কিন্তু মৃণালের মুখে যে কোনো ঘোমটা নেই—নিজেকে সে যে নিঃশেষে প্রকাশ করে' দেয় তার শরীর দিয়ে—যেটুকু তার দেখা যায়, সে তা-ই, তা ছাড়া কিছু নয়। প্রতিমার বিভূতি তার মধ্যে নেই: সে সীমাবদ্ধ পুতুল। চিরকাল ধরে' তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না: প্রতি মুহূর্ত্তের নতুন আলোয় সে অপরূপ নয়। তাকে নিয়ে মিহির কী করবে, কেমন করে' দেখবে তাকে?

মিহিরের মত স্বভাবের লোক হয় নিজেকে ভালোবাসায় উজাড় করে' দেবে—তখন সাবধান, হে কুমারী, লজ্জাজড়িত, আরক্তকপোল, অস্ফুটবাণী যুবতী, সাবধান!—না হয় থাকবে দূরে সরে', নিজের গোপনতায় অবরুদ্ধ। সে কখনো চেষ্টা করে', জোর করে' ভালোবাসবে না; কখনো তাড়া করবে না, ফন্দি আঁটবে না, তৈরি করতে চাইবে না। সে বরং প্রেমহীন, দুঃখের জীবন কাটিয়ে যাবে; কিন্তু তৈরি-করা ভালোবাসা—না, না, মরে' গেলেও

নয়। তা যেন ফুটে ওঠে নিজেরই ভিতর থেকে—আকস্মিক, অকারণ, দুর্ব্বোধ্য, যদি কখনো তা হবার হয়। তাকে হ'তে দাও, তাকে না-হ'তে দাও, জোর করে' তাকে হওয়াতে যেয়ো না। আর সেইজন্য স্ত্রীর প্রতি তার অনতিক্রম্য বিমুখতা, উদাসীনতা। আমাকে একা থাকতে দাও, আমাকে স্পর্শ কোরো না: ফেনিয়ে-তোলা মনের ক্লেদাক্ত সংস্পর্শ থেকে আমায় রক্ষা করো, দেবতা। স্ত্রী, তার স্ত্রী—ভাবতে হাসি পায়। সে তার স্ত্রী, সে তার স্ত্রী, সে তার। তার! ঘৃণিত, বিষাক্ত কথা। একজন মানুষ কেন আর-একজনের হবে? তোমরা বলতে পারো, তার কি কোনো কারণ আছে? না, এ-মূঢ়তা তার কাছে চলবে না। কোনো মানুষ তার, এ-অপমান সে সহ্য করবে না। সে মুক্ত থাকবে, সে থাকবে পবিত্র। যাকে সে নিজের করে' নিতে পারে না, সে তার—এ কেবল অপমান নয়, এ তো নিছক যন্ত্রণা। নীরবে, গোপনে মিহির যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগলো।

এমনি তাদের বিবাহিত জীবন। মিহির লুকিয়ে রাখলো তার যন্ত্রণা, তা প্রকাশ করায় কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম রুচিস্খলন। সেটা তার লজ্জা, তা দেখাতে গেলে লজ্জা দ্বিগুণ হ'য়ে উঠবে। যাকে সে ভালোবাসতে পারে না, তাকে আঘাত করতে গেলে নিজেরই কাছে ছোট হ'য়ে যেতে হয়। সে তা পারে না। যাকে ভালোবাসা যায় না তাকে দয়া, অন্তত, করতে হয়—নয় তো

আত্ম-সম্মানে ঘা লাগে। তাই মৃণালের প্রতি তার বাইরের ব্যবহারে খানিকটা প্রশ্রয়, খানিকটা সহিষ্ণুতা—যেমন ব্যবহার আমরা করি শিশুর প্রতি, পোষা জানোয়ারের প্রতি, আর্থিক কারণে সম্পূর্ণ আমাদের অধীন কোনো মানুষের প্রতি। বাইরের আবহাওয়া শান্ত, নিস্তরঙ্গ—হঠাৎ দেখলে সুখের বলে' ভুল হ'তে পারে। কিন্তু ভিতরে সব ফাঁকা, শূন্যময়, পাথরের দেয়ালের মত বোবা রাত্রি।

যে-কোনোরকমের দেখানোপনাকে মিহির ভয় করে। তার অবজ্ঞাকেও সে কোনো কঠিন, নির্দ্দিষ্ট রূপ দেবে না। তাকে ভাসতে দেবে হাওয়ায়, প্রেতের নিঃশ্বাসের মত, অনিশ্চিত, অথচ অনস্বীকার্য্য প্রেত-উপস্থিতির মত। ঠিক জায়গায় গিয়ে তা ঠিক ভাবে লাগে, কিন্তু বাইরে কিছু বোঝা যায় না; বাইরে সব সমতল, মসৃণ। আর তার মা-কে মনে রাখতে হয় সব সময়েই। কোনো প্রশ্ন তাকে যেন শুনতে না হয়, কোনো জবাবদিহির দায় যেন তার উপর না পড়ে। তাই মাঝে-মাঝে, বিশেষ করে' মা যখন কাছাকাছি থাকতেন, সে মৃণালের সঙ্গে একটু এটা-ওটা আলাপ করতো, সাংসারিক কোনো তুচ্ছতা। হয়-তো এমন কথাও জিজ্ঞেস করতো: 'আজ তোমাকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?' কি 'চুলগুলো শুকোতে পারো না ভালো করে'?' না, কপটতা নয়; দুর্ব্বলতা—হয়-তো। অনুভূতিশীল মনে বিমুখতার

জন্য লজ্জা। ভালোবাসবার অক্ষমতার উপর আচ্ছাদন। যার সঙ্গে এক বাড়িতে সব সময় বাস করতে হচ্ছে তার সঙ্গে কোনো স্পষ্ট, রূঢ় ব্যবধানের মত অস্বস্তি আর-কিছু নেই: সেটাকে যথাসাধ্য কমিয়ে আনা।

মৃণাল নানানসই জবাব দিতো—মৃদুস্বরে, সোজা তার স্বামীর মুখে তাকিয়ে। যেন হঠাৎ কিসের সুর লাগতো তার কথায়। সে-ও কি বুঝতো এই খেলা, এই নাটক, তার নিজের ভূমিকা? যা-ই হোক, কোথাও আটকে যেতো না, মসৃণ সমতলতার কোণ বেরিয়ে পড়তো না কোথাও।

আর রাত্রে—মিহির অনেক রাত জেগে পড়াশুনো করে। নীল ঢাকনা-দেয়া টেবল্‌-ল্যাম্পের নরম আলোর সঙ্কীর্ণ চক্রের মধ্যে তার আনত মাথা। হাতের কাছে ছাইদানে জ্বালানো সিগ্রেট, তা থেকে ফিকে নীল ধোঁয়া পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠে উপরের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘরের ভিতরের দিকে পাৎলা অন্ধকার, খাটের উপর মশারি ফেলা। সেখানে মৃণাল ঘুমিয়ে। ঘুমিয়ে?—হ্যাঁ, তা-ই তো, কারণ বিছানার দিক থেকে অস্ফুটতম কোনো শব্দও কখনো আসে না। সমস্ত দিনের কাজের পরে ক্লান্ত, বালিশে মাথা রাখা মাত্র মৃণাল ঘুমিয়ে পড়ে। কখনো যদি তার শুয়ে-শুয়ে ঘুম না আসে, কখনো যদি সে খোলা, কালো চোখে কালো অন্ধকারের ভিতরে তাকিয়ে থাকে, তা জানবার উপায় নেই। মিহির

যখন শুতে যায়, সে তাকে দেখে গভীরভাবে নিদ্রিত। সে-সময়ে তারও চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে, তার ভিতর দিয়ে মৃণালের অস্পষ্ট, আবছায়া মূর্ত্তি সে দেখতে পায়—ঘুমে এলানো, ঘুমে অন্ধকার। শুনতে পায় তার গভীর, নিয়মিত নিঃশ্বাস। খাটের এক প্রান্তে সে লীন, বিছানার প্রায় সমস্তটা মিহিরের দখলে। আর, একটু পরে সে-ও ঘুমিয়ে পড়ে, সেকেলে নক্সার সেই প্রকাণ্ড, ভারি খাটে, তার মা-বাবার বাসর-শয্যা, যার উপর ছেলেবেলায় সে গড়াতে ভালোবাসতো, বড় হবার পর থেকে প্রত্যেক রাত্রি যার উপর সে ঘুমিয়েছে। সে উঠতো দেরি করে', মৃণাল উঠতো ভোরের প্রথম আলোর সঙ্গে। মৃণাল কখন উঠতো, সে একদিনও তা টের পেতো না।

ছায়ার মত চুপচাপ, ছায়ার মত মৃদুসঞ্চারী, মৃণাল তার কাজ নিয়ে চলাফেরা করে সারাদিন ভরে'। এক মুহূর্ত্ত তাকে বিশ্রাম করতে দেখা যায় না। আর মিহিরের অসংখ্য নিশ্চেতন প্রয়োজন একজন স্ত্রীলোকের সমস্ত সময় নিযুক্ত রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। অভাব হ'লে সে-সব চোখে পড়ে, মিটলে খেয়াল হয় না। মৃণালের সমস্ত প্রাণের ছন্দ যেন ঝরে'-ঝরে' পড়তে লাগলো সেই-সব কাজে—তা-ই দিয়ে ভরে' উঠতে লাগলো তার ক্রীতদাসীর আত্মা, তার মায়ের-আত্মা। নিজেকে সে ডুবিয়ে দিলে মিহিরের বহির্জীবনে, গৃহ-জীবনে: সেই গৃহের সঙ্গে এক হ'য়ে উঠলো সে।

সূর্য্যমুখী

মিহির তার মা-র হাতে যেমন ছিলো, তেমনি রইলো; কোনো প্রভেদ লক্ষ্য করতে পারলে না। কোনো অদৃশ্য হাত চাইবার আগেই তার সমস্ত অভাব মিটিয়ে যাচ্ছে—চিরকাল যেমন হচ্ছে। যে-সব জিনিস সে খেতে ভালোবাসে, তা-ই আসছে ঘুরে-ঘুরে, সুস্মা, প্রীতিকর বৈচিত্র্যে; যতই দেরি করে' সে খেতে বসুক, ভাত যেন এই একটু আগে উনুন থেকে নামানো হ'লো। রোজ বিকেলে হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে সাফ জামা-কাপড়, আর জামার বোতামগুলো সব সময় ঠিক জায়গাতেই আছে। চায়ের জন্য একবারও ডাকতে হয় না, খাওয়া হ'য়ে গেলে বাসন-গুলো এক মুহূর্ত্ত পড়ে' থাকে না টেবিলে; ছাইদানিতে এক ঘণ্টার ছাই জমে' উঠতে পারছে না। মৃণাল ঝাড়ছে আর ধুচ্ছে আর ঘষছে—ঘরের দেয়াল আর মেঝে, আসবাব আর আয়না, জানলার কাচ আর কাঠ; বিছানা টেনে নিয়ে মেলে দিচ্ছে রোদ্দুরে, আবার টেনে আনছে; বাথরুমে নিয়ে কাচছে ওয়াড়; কখনো হয়-তো চাকরের মত জুতো বুরুশ করছে—চাকরটা কাছে দাঁড়িয়ে হাঁ করে' দেখছে—তার দুই দীর্ঘ বাহুর ভঙ্গিতে যেন অজস্র, প্রবল প্রাণ উচ্ছলিত হ'য়ে পড়ছে। তার যেন যথেষ্ট করবার নেই—নিজেকে সে ছড়িয়ে দিতে চায়, আরো, আরো; আরো নিবিড় করে' এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে যেতে চায়। এই বাড়ির মুক আত্মার সঙ্গে তার মুক আত্মার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। কোনো অদ্ভুত,

অচেতন অধিকারে এই বাড়িকে সে নিয়েছে—দু'হাত ভরে', সমস্ত জীবন ভরে' নিয়েছে। এখানে সে পেয়েছে তার শান্তি। এই বাড়ি আর এ-বাড়ির মধ্যে যা-কিছু আছে সব তার দখলে—তার শান্ত নীরবতার অন্তর্গত। এ-সব কাজেই তার সত্তার পরিপূর্ণতা, তার আনন্দ—যে-আনন্দ মিহিরের, চাঁদের দিকে তাকিয়ে। তার বাহুর সকল ভঙ্গিতে সেই আনন্দের স্রোত, সৃষ্টির স্রোত। সৃষ্টিশীল স্রোত—অন্ধকার উত্তাপে বয়ে' যাচ্ছে সমস্ত বাড়ির ভিতর দিয়ে। ক্রীতদাসী-আত্মার উত্তপ্ত অন্ধকার স্রোত।

আর কী? যে-জন্য বিয়ে করা তা তো হ'লো, তা তো পরিপূর্ণ মাত্রাতেই হ'লো। হৈমন্তীর হাতে এখন এত কম কাজ যে মাঝে-মাঝে তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। সময় কাটাবার জন্য নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন জিনিস তাঁকে সেলাই করতে হয় বসে'-বসে'। মিহিরের বুকের মধ্যে আর ধাক্কা লাগে না—তার মা-র কালো-হ'য়ে-আসা মুখের শীর্ণতা দেখে। নিজেকে আর অপরাধী মনে হয় না এই স্ত্রীলোকের কাছে, যার প্রাণ-রস প্রতি মুহূর্তে শোষণ করে' তার এই নবীন শরীর-তরু।

—নিজেকে অপরাধী মনে হয় বই কি, কোনো সূক্ষ্মভাবে, অন্য স্ত্রীলোকের কাছে, মৃণালের কাছে। এ না হ'য়ে মা হ'লেই যেন ভালো ছিলো। পুরুষের জীবনে কোনো দাসী যদি না থাকলেই নয়, সে-দাসী মা হ'লেই সব চেয়ে ভালো। সেখানে কোনো

কৃতজ্ঞতার, কোনো দায়িত্বের বোঝা নেই ; সেখানে মুক্তি। যাকে ভালোবাসি তার প্রতি নিষ্ঠুর হ'লেও মানায়, তার প্রতিই নিষ্ঠুর হওয়া যায়। নিজের জন্য তার সমস্ত প্রাণ নিঃশেষে নিঙড়ে নেয়াও ভালো ; তা যদি অপরাধ হয় সে ভালোবাসারই অপরাধ, অপরাধ করবার অধিকার ভালোবাসারই আছে। কিন্তু যাকে ভালোবাসিনে, সে যখন সমস্ত প্রাণ শরীরের শিকড়ে-শিকড়ে সঞ্চারিত করে' দেয়—তা প্রত্যাখ্যান করবার উপায় থাকে না—এমন সূক্ষ্ম, অনির্দ্দিষ্ট তার গতি, এবং অনিবার্য্য তার প্রয়োজন—এবং তা সহ্য করাও সহজ নয়। সেটা মনের উপর একটা ভার—কৃতজ্ঞতার মৃত স্তূপ। সব চেয়ে বিশ্রী এই কৃতজ্ঞতা—কেন একজনকে বাধ্য করা হবে আর-একজনকে মনে করে' রাখতে? কিছু নিয়ে যদি ভোলা না যায় তা হ'লে না-নেয়াই ভালো—যদি সম্ভব হয়। ভুলতে পারাই মুক্তি। আর তা না হ'লে, সেই ভার হালকা করবার জন্য ডেকে আনতে হয় শীর্ণ শ্বেত দয়াকে—রক্তহীন প্রেত! কী অত্যাচার আত্মার উপর—দয়া করবার এই নীরক্ত শ্বেত প্রয়োজন।

হয়-তো কোনো বিকেলে, একটু-একটু করে' চায়ে চুমুক দিতে-দিতে মিহির বই পড়ে, মৃণাল দাঁড়িয়ে থাকে পাশে, নীরব, অপেক্ষমান, স্বামীর খাওয়ার মধ্যে অদ্ভুতরকম আবিষ্ট। তাকে টের পাওয়া যায় না, তাকে লক্ষ্য করবার দরকার করে না। মিহিরের কোলের উপর বই : ডান হাত দিয়ে পাতা ওল্টাতে-

ওল্টাতে বাঁ হাতে সে রুটিতে কামড় দেয়, সাদা মুড়মুড়ে গুঁড়ো ভেঙে পড়ে পাতার মাঝখানকার ফাঁকে—তা ঝাড়বার জন্যে আস্তে সে একবার ফুঁ দেয়। আস্তে-আস্তে সে খায়, অর্দ্ধ-চেতন, অর্দ্ধ-মনা, যেন তার কোনো তাড়া নেই—যেন শরীরের মধ্যে চায়ের উষ্ণ সঞ্চারের সঙ্গে-সঙ্গে কাব্যের উদ্দীপনা অনুভব করতে-করতে সে কাটিয়ে দেবে চিরন্তন বিকেল। সেই তার মুক্তি, তার তন্ময়তা, তার সত্তার পরিপূর্ণতা। দু'জনের পরিপূর্ণতা চলতে থাকে সমান্তরাল স্রোতে—কেউ কাউকে ছোঁয় না।

তবু হঠাৎ হয়-তো, টি-পটের ঢাকনা তুলে আরো চা আছে কিনা দেখতে গিয়ে কি সিগ্রেট ধরাতে গিয়ে—হঠাৎ মিহিরের খেয়াল হয় মৃণালকে। মৃণালের স্তব্ধ, আত্ম-বিস্মৃত মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে তার খারাপ লাগে, কেমন একটু রাগ হয়। অন্যায়—নিজেকে এমন করে' অপসৃত করবার কী অধিকার তার আছে? এই অপসৃতিতেই তার নিহিত শক্তির বিস্তার। মিহিরের অস্বস্তি লাগে। যদি সে দু'একটা কথা কইতো, তা হ'লে ভিতরে-ভিতরে এই চাপা অস্বস্তি জমে' উঠতো না।

'বোসো না', তার মুখের দিকে না-তাকিয়ে মিহির বলে, 'এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো!'

'তোমার খাওয়া হোক, বাসনগুলো নিয়ে যাই।'

'নিয়ে যাও।'

'চা তো আরো আছে।'

'নিচ্ছি ঢেলে। তুমি—তুমি তো চা খাও না। একেবারেই খাও না?

'অভ্যেস নেই।'

মিহির তার শেষ পেয়ালা ঢেলে নেয়। আলাপ এগোয় না। সত্যি, বলবার তো কিছু নেই। হয়-তো মৃণাল তা আশাও করে না। হয়-তো সত্যি তাকে দয়া করবার প্রয়োজন নেই। মিহির তাকে দেখছে তার নিজের আলোয়, নিজের ভিতর থেকে, সেইজন্য তার সঙ্কোচ। নিজের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে মৃণালের হয়-তো অন্যরূপ। সে-ও হয়-তো নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ, মিহিরের মত—অন্য-কোনো শান্তিতে, অন্য-কোনো শক্তিতে।

মৃণাল তার স্বামীর তন্ময়তার দিকে তাকিয়ে থাকে—কেমন এক-রকম গভীর, নিঃশব্দ ধরণে—নির্নিমেষ নিঃশেষ সেই দৃষ্টি! যখন সে পড়ে, যখন সে লেখে, যখন সে চুপ করে' বসে' থাকে, যখন হঠাৎ লেখা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে সে পায়চারি করে। যে-অসহ্য অনুভূতিতে, যন্ত্রণার মত যে-আনন্দে মিহিরের আত্মা আলোড়িত, তা সে জানে না। সে কিছু জানে না, কিছু বোঝে না: সে শুধু দেখতে পারে, শুধু ভাখে। এটাই যেন ঠিক, মিহির যে তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কিছুই যে দেখতে পাচ্ছে না; তার কাছে যে তার কোনো অস্তিত্বই নেই, এটাই যেন ঠিক।

এই বিলুপ্তিই যেন মৃণালকে কেমন করে' ভরে' তোলে। মিহিরের নিবিড় নিবদ্ধ কৃশ মুখ—যেন ভিতর থেকে কোনো আলোয় উদ্ভাসিত—সুদূর, দুর্ব্বোধ্য, স্পর্শাতীত, কোনো সুদূর দেবতার মুখের মত। কোনো সুদূর দেবতা—মৃণালের শরীরের ধূপতি থেকে পূজার ধোঁয়া উঠছে তার দিকে; স্তবগানের মত গুঞ্জিত তার রক্তের স্রোত; তার সমস্ত প্রাণ সে তুলে ধরছে, সে লুটিয়ে দিচ্ছে একটি সম্পূর্ণ অঞ্জলির মত। বলো, দেবতাকে কে স্পর্শ করবে—এই সুদূর, বিহ্বল, নিভৃত দেবতা। শুধু নিঃশব্দ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, শুধু পূজায় ঝরে' পড়া। কখনো রাত্রে মৃণাল ঘরে এসে দেখে টেবিল্‌-ল্যাম্পের সঙ্কীর্ণ আলোর চক্রে মিহিরের আনত মাথা, তার মুখের খানিকটা ছায়ায়, সমস্ত আলোটা পড়েছে তার কালো, কোঁকড়া চুলে। আলোর সেই সঙ্কীর্ণ চক্রে সে আবদ্ধ, সম্পূর্ণ—কোনোখানে আর-কিছু নেই। চারদিকে সে নিঃশব্দতা দিয়ে ঘেরা, নির্জ্জন রাত্রি দিয়ে ঘেরা। সেই রাত্রির সীমানায় অন্য-কোনো পৃথিবী—সেখানে চিরকালের রহস্য। আর সেই নিভৃত কৃশ মুখের দিকে তাকিয়ে, মৃণাল ভরে' যায় রহস্যে আর আতঙ্কে—সে জানে না, নির্জ্জন রাত্রির সীমানায় কী আছে, তা সে জানে না। ভাবতে পারে না। শুধু তার মধ্যে ঐ বিশাল রহস্যের অন্ধকার। অন্ধকারের ভিতরে সে মিলিয়ে যায়, ছায়ার মত।

সূর্য্যমুখী

স্বামীকে সে কখনো মন দিয়ে জানতে চায় নি। তার মনকে সে ফেলে রেখেছিলো রহস্যের অন্ধকারে। সে জানতো যে মিহির লেখে, কিন্তু যা লেখে তা উল্টিয়ে দেখবার ইচ্ছা তার কখনো হয়নি। তা যেন বাহুল্য ; দূর থেকে চুপ করে' যে তাকিয়ে থাকা, তারই ভিতর দিয়ে তো সে নিজেকে নিঃশেষ করে' দিচ্ছে—আর-কিছুর দরকার নেই। মিহিরের টেবিলের কাগজপত্র নিয়ে সে কখনো নাড়াচাড়া করতো না, দেরাজ খুলতো না কখনো। একবার সে ভুল করেছিলো, প্রথম দিকে, না জেনে। সমস্ত ঘরের শৃঙ্খলা সম্পাদন করে' সে গুছিয়ে রেখেছিলো মিহিরের লেখার টেবিল, বইপত্র ইত্যাদি। কিন্তু, সে বুঝতে পারলে, মিহির তা চায় না। স্পষ্ট করে' সে কিছু বলেনি, কিন্তু মৃণাল তার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলো। সমস্ত বাড়ির মধ্যে এই একটুখানি জায়গা মিহিরের, নিছক স্বত্বের চাইতে গভীরতরো, স্থায়ীতরো কোনো অর্থে তার। এখানে সে অন্য কাউকে হাত দিতে দেবে না। সুতরাং এর পর থেকে সমস্ত ঘর ঝকঝক করছে, কিন্তু মিহিরের টেবিলে সেই চিরন্তন বিশৃঙ্খলা।

কারণ সেই বিশৃঙ্খলা মিহির ভালোবাসতো। সেটা তার নিজের হাতের কাজ, সেটা তাকে দিয়ে ভরা। সে-ই যেন ছড়িয়ে আছে এলোমেলো কাগজ-পত্রে, নানারকম বেকায়দায় ফেলে রাখা বইয়ের স্তূপে। এর ছন্দ সে নষ্ট হ'তে দিতে পারে না।

সূর্য্যমুখী

মানুষের জীবনে কিছু থাকা দরকার, যা একমাত্র তার, একান্তরূপে তার। তার নিঃসঙ্গ, গোপন কোনো সত্তা ; এমন একটা জায়গা যেখানে সমস্ত পৃথিবীর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে' দেয়া যায়। ভালোবাসার জোরেও কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না, কেবল ভালোবাসা সেখানে যথেষ্ট নয়। এমন কি, প্রচলিত অর্থের ভালোবাসার দরকারও করে না। সেই নিঃসঙ্গতার দরজা কেবল তার কাছেই খুলে দেয়া যায়, যার সঙ্গে আমার সুরের মিল। যার সঙ্গে এক ছন্দে আমার রক্তের প্রবাহ। সে-রকম মানুষ জীবনে বেশি পাওয়া যায় না, দু'একজন পেলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে হয়। অত্যন্ত বিরল, মুক্তো-ছিটোনো কয়েকটি মুহূর্ত্ত বাদ দিয়ে, দরজা বন্ধই থাকে—বন্ধ থাকাই উচিত। মৃণাল সমস্ত বাড়ি ভরে' নিজেকে ছড়িয়ে দিক্, কিন্তু সেখানে দরজা বন্ধ। মিহির তার নিঃসঙ্গতা নিয়ে যা করে, মৃণাল নিতান্ত বাইরে থেকেও তা ছুঁতে পারবে না। সে যে তার কাগজপত্র ইত্যাদি গুছিয়ে রাখবে এটুকু আক্রমণ, এটুকু সংস্পর্শ পর্য্যন্ত মিহিরের কাছে অসহ্য।

কোনো রাত্রে, বন্ধুদের কোনো আড্ডা থেকে ফিরতে মিহিরের দেরি হ'তো। এসে দেখতো মা-র ঘর অন্ধকার, মৃণাল একা বসে' আছে চুপচাপ, হয়-তো হাতে কোনো সেলাই। তাকে দেখে সে উঠে দাঁড়াতো, আস্তে-আস্তে যেতো রান্নাঘরের

দিকে। আর মিহিরের গলা পর্য্যন্ত যেন হঠাৎ রাগ ঠেলে উঠতো—এই ধৈর্য্যের মুর্ত্তি, এই জন্ম-দাসী, নির্ব্বাক পোষ-মানা এই স্ত্রী-পশুকে দেখে।

'তুমি এখনো খাওনি?'

মৃণাল চুপ।

'তুমি এখনো খাওনি?'

'না।'

'কেন খাওনি? এতক্ষণ না-খেয়ে তুমি বসে' আছো কেন? কে তোমায় বসে' থাকতে বলেছে?'

'কেন? এতে দোষ কী?'

'আছে দোষ। আমার এ-সব ভালো লাগে না।'

'আমার ভালো লাগে।' মৃণালের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত শান্ত, তাতে এতটুকু প্রতিবাদের সুর নেই: যেটা সত্যি, তা-ই যেন অত্যন্ত সহজভাবে বলছে। মুহূর্ত্তের জন্য মিহিরের চমক লাগে। একটু অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকায়। এ-কথার সে কী জবাব দেবে? তবু, তার রাগের বাষ্পগুলো উঠছে ঠেলে, তারই ঝোঁকে সে ব'লে' ফেলে:

'ভালো লাগা উচিত নয়। এ-রকম তুমি আর করতে পারবে না।'

'তা হ'লে কী হবে?'

'কী আবার হবে—ভাত চাপা দিয়ে রাখবে এ-ঘরে।'

'আর তা-ই তুমি খাবে?'

সোজা, সরল প্রশ্ন, কিন্তু মিহিরের মনের মধ্যে খোঁচা লাগে; তার মনে হয় মৃণাল যেন তার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিচ্ছে, তাকে আটকাতে চাইছে তার নিজেরই দুর্ব্বলতার জালে। ওঃ নারী, নারী! কল্যাণী, মুর্ত্তিমতী করুণা, ইত্যাদি, ইত্যাদি: আমাদের খাওয়ার জন্য, ঘুমের জন্য, আরামের জন্য, সুখের জন্য ভাবনার অন্ত নেই তোমার। কিন্তু সেই ছলনায়, তার সুযোগ নিয়ে তুমি আমাদের আটকাতে চাও; আমাদের দুর্ব্বল করে' দিয়ে সেই দুর্ব্বলতাকে করে' তোলো তোমার হাতের অস্ত্র। তুমিও আমাদের জড়াতে চাও, আমাদের আত্মাকে জড়াতে চাও। তুমিও রক্ত-শোষক—যদিও তা টের পাওয়া যায় না, আর সেটাই সব চেয়ে ভয়ানক। অনেক, অনেক ভালো মোহিনী, মায়াবিনী ইত্যাদি, বুকের উপর মুখ রেখে যে রক্ত-শোষণ করে—তার মধ্যে, আর যা-ই হোক, কোনো কপটতা নেই। মায়াবিনীর ক্ষুধিত, লাল অধর কোনো মিথ্যে কথা বলে না। আর তুমি শুভ্র, তুমি পবিত্র, হে কল্যাণী, অলক্ষিতে, অজ্ঞাতে তুমি আমাদের জড়াও, তোমার স্নেহে, তোমার করুণায়; আমাদের আত্মাকে উপড়ে আনতে চাও তোমার করুণার, কল্যাণের সূক্ষ্ম, নরম হাতে। হে কল্যাণী, নিত্য আছো আপন গৃহকাজে। কিন্তু গৃহকাজ

নিয়েই তুমি থাকো; তার বাইরে আর এসো না; তোমার গৃহকাজের সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে পদে-পদে আমাদের লিপ্ত কোরো না, আমাদের বাধিত কোরো না—দূরে থাকো। তোমার বিরল পুষ্পভবনে দূরে থাকো। তোমার আম্রশাখে কোকিলের ডাক আর তোমার শিশুর কলধ্বনি—সব তুমি রাখো; কিন্তু আমার আত্মাকে ছেড়ে দাও, আমার আত্মাকে ছুঁয়ো না!

একটু চুপ করে' থেকে মিহির বলে: 'না—ও-রকম তুমি আর কোরো না। খামকা না-খেয়ে বসে' থাকবার কোনো দরকার নেই।'

মৃণাল কিছু বলে না, তার মুখ দেখে মনে হয় কথাটা সে মেনে নিয়েছে। কিন্তু এর পরে যে-রাত্রে মিহিরের ফিরতে দেরি হয়, মৃণাল তেমনি বসে' আছে, চুপ করে', কোলের উপর দু'হাত জড়ো করা, কি হাতে কোনো সেলাই। রোজ এক কথা বলতে মিহিরের ভালো লাগে না; একটি কথা না-বলে' সে খেয়ে নেয়। ক্রমে এমন হ'লো যে তার আর রাগ হয় না। লক্ষ্য করতেই সে ভুলে গেলো। সে মেনে নিলে—মৃণালের অন্যান্য কাজ, সমস্ত মৃণালকে সে যেমন মেনে নিয়েছে। মৃণাল সম্বন্ধে তার মনের এমন আগ্রহও নেই যে বেশি রাগ করা যায়।

৪

এমন অনুমান করা যেতে পারে যে এই বিয়ে থেকে যতটা সুখ পাবার, তা পেয়েছিলেন হৈমন্তী। তিনি যা চেয়েছিলেন তা-ই হ'লো। আর মৃণালের নির্বাচন যে তাঁর কতটা ঠিক হয়েছিলো সে দু'দিনেই তার প্রমাণ দিয়েছে। মৃণালের মধ্যে হৈমন্তী মনের শান্তি পেলেন। এ-মেয়েকে বিশ্বাস করা যায়, এর উপর নির্ভর করা যায়।

তবু, কোথায় যেন একটা অতি সূক্ষ্ম চিড়। বাতাসে যেন কী। আজকালকার ছেলেমেয়েদের এই কি প্রণয়ের ধরণ—তিনি ভাবলেন। দু'জনকে এক সঙ্গে তিনি মাঝে-মাঝে লক্ষ্য করতেন— কিছু কি ধরা পড়তো, কিছু কি বোঝা যেতো? না, আঙুল দিয়ে দেখানো যায়, এমন কিছু নয়। শুধু, কোনো হঠাৎ হাওয়ায়, অস্পষ্ট একটা পরদা ঝলসে উঠতো চোখের সামনে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে হৈমন্তী ভাবতেন, সেই অস্পষ্ট পরদাকে টুকরো-টুকরো করে' ছিঁড়তেন মনে-মনে। আর হঠাৎ একটা দারুণ ভয়ে তাঁর হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হ'য়ে যেতো—বুঝি তিনি ভুল করেছেন।

কী ভয়ানক, অন্যের জীবন নিয়ে কোনো ভুল করা! কেন আমরা অন্যের জীবন নিয়ে ভালো-মন্দ কিছু করতে যাই? যে যার জীবন নিয়ে যেমন খুসি করুক—সে-ই তো সব চেয়ে ভালো।

আর হৈমন্তীর মনে যন্ত্রণার মত একটা কথা মোচড় দিয়ে উঠতো : এ তো তাঁরই জন্যে, তাঁরই গরজে। নিজের আগ্রহে অন্ধ হ'য়ে কি তিনি···তা-ই বা কেন, বিয়ে তো সবাইকেই করতে হয়—আর কখনো যদি করেই, তা হ'লে এখন কেন নয়? তা ছাড়া, মিহির কি বলতে পারতো না—যদি ওর বলবার কিছু থাকতো। যুক্তি দিয়ে খুঁজে-খুঁজে তিনি কোনো দোষ দেখতে পান না। তবু!

একদিন তিনি ছেলের কাছে গিয়ে বললেন : 'তুই মাঝে-মাঝে বৌকে নিয়ে একটু বেড়াতে গেলেই পারিস্?'

উত্তর দেবার আগে মিহির মা-র চোখের দিকে একটু তাকিয়ে রইলো। বিয়ের পর থেকে মা-র সঙ্গে তার কেমন একটা ব্যবধান গড়ে' উঠছিলো। মৃণাল চাপা দিয়েছে তার মা-কে। প্রতিদিনের নানা ছোটখাটো প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে তাঁকে আর পাওয়া যায় না। দিনের বেলায় মা তার খাবার কাছে এসে বসেন; সমস্ত দিনের মধ্যে সেই সময়টুকুতেই তাঁর সঙ্গে তার যা কথাবার্তা। তাও সে-রকম নয়, আগেকার দিনে যেমন হ'তো। কোথায় যেন বাধা। মৃণালের উপস্থিতি মাঝখানে।

বেশ, তা-ই হোক্ তবে। এ অবস্থা তো মা-র নিজেরই হাতের তৈরি। তিনিই এটা চেয়েছিলেন, তিনি এতে খুসি। এখন আর কিছু বলবার নেই। নিজেকে সে আস্তে-আস্তে সরিয়ে আনলে মা-র কাছ থেকে। তার মনের মধ্যে একটা বোবা

ক্ষোভ। আ—কেন সে তার মা-র সুখের কথা ভাবতে গিয়েছিলো? সুখ দিয়ে কী হয়? মা-কে সে খাটাতে-খাটাতে মেরে ফেলতে পারলে না কেন?

তার মনে হ'লো, যেন কতদিন পর আজ মা-কে ভালো করে' দেখলো। আর হঠাৎ একটা বিদ্বেষের ধাক্কায় পাংশু হ'য়ে গেলো তার মুখ। তাই! তার মা এখন এসেছেন তাকে দিয়ে মৃণালকে ভালোবাসাতে। এতেও তাঁর তৃপ্তি হয়নি। তার আত্মার উপর তাঁর অপ্রতিরোধ্য অধিকার—এবং তিনি তা জানেন। সেই অধিকার তিনি খাটাবেন তাঁর মরজি-মত। তাকে তিনি বাঁকাবেনই তাঁর অন্ধ ইচ্ছার চাপ দিয়ে-দিয়ে। তার উপর তার মা-র ইচ্ছার নিষ্ঠুর পাষাণ-নিষ্পেষণ—তা ছাড়া তার বিয়ে আর কী? অন্যায়, সব চেয়ে বেশি অন্যায় এই কারণে যে আঘাতটা পড়েছিলো তার হৃদয়বৃত্তিতে, যেখানে সে সব চেয়ে দুর্ব্বল। নিছক প্রবঞ্চনা—কিন্তু স্ত্রীলোক সব পারে। সম্পূর্ণ জেনে-শুনে একটা বাঁদর-নাচ সে নেচেছে। তাতেও হবে না—আরো একটা বাঁদরামো তাকে করতে হবে। ভালোবাসতে হবে তার স্ত্রীকে। সত্যি?

একটু চুপ করে' থেকে সে বললে, 'কেন, ওর শরীর খারাপ হচ্ছে নাকি?'

'শরীর খারাপ না-হ'লে বুঝি মানুষের বেড়াতে বেরোতে নেই?

দিনের পর দিন বাড়ির মধ্যে বন্ধ হ'য়ে কাটাতে ভালো লাগে কারো ?'

'বন্ধ কেন বলছো ? এমন স্বাধীনতা আর কোথায় ? তা ছাড়া, ভালোও ওর লাগে। অন্য কোথাও গেলেই ভালো লাগবে না।'

'কী করে' জানলি ?'

জানি। যার যা ভালো লাগে তাকে তা করতে দেয়াই হচ্ছে মনুষ্যধর্ম্ম। তুমি কেন জোর খাটাতে যাবে ?'

হৈমন্তী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মুহূর্ত্তকাল। তাঁর দৃষ্টি জিজ্ঞাসায় সঙ্কুচিত। মিহিরের কথার সুর তাঁর ভালো লাগলো না। অনেক কথা একসঙ্গে তাঁর মনে হ'লো; কিন্তু তিনি চট করে' কিছু বললেন না, পাছে ভুল কথা বলে' ফেলেন। অন্ধকার তিনি যেন হাতড়ে ফিরছেন, বেরোবার পথ খুঁজে-খুঁজে।

মিহিরই আবার বললে : 'তা ছাড়া এতে এমন-কিছু এসেও যায় না। তুমিও তো বাড়ি বসে'ই দিন কাটাও।'

'আমার সঙ্গে ওর কী কথা ?'

'নয়ই বা কেন ? তুমি যা পারো, ও কি তা পারবে না ? না-পারতেও দেখিনে তো।' বলে'ই, পাছে তার ভিতরের কোনো বিক্ষোভ, কোনো বিদ্বেষ কথার সুরে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে :

'অবিশ্যি তুমি যদি বলো' মুচকি হেসে হালকা সুরে সে বলে'

উঠলো,' ওকে নিয়েও যেতে পারি বেড়াতে। যেখানে খুসি। যদি ভাগ্যক্রমে এমন হয় যে ও ভিক্টরিয়া মেমরিয়ল দেখেনি, তা হ'লে আর কোনো ভাবনা থাকে না। কেবল সব চাইতে জমজমাট শাড়ি পরবার অপেক্ষা।'

মিহির মৃদুস্বরে হেসে উঠলো। সেই হাসির ভিতর দিয়ে সে তার বিষকে ঢেলে দিচ্ছে রূপান্তরিত করে'। অকপটরকম হালকা গোছের কথা—তার বিরুদ্ধে কী বলা যেতে পারে? হৈমন্তী যেন কোণ-ঠাসা হ'য়ে পড়লেন। যদি হ'তো প্রকাশ্য বিরোধিতা তা হ'লে আলাদা কথা ছিলো: তা হ'লে ইচ্ছার সেই যুদ্ধে, আর যা-ই হোক্, ছেলের মনের সমস্ত জড়ানো সুতোগুলো খুলে-খুলে যেতো, হয়-তো চলে' আসতো তাঁর হাতের মুঠিতে, তারপর তিনি সেগুলোকে যেমন-খুসি নক্সায় ফেলতে পারতেন। কোনোভাবে, তাঁর অস্পষ্ট স্ত্রী-আত্মার কোনোখানে তিনি জানতেন, ছেলের উপর তাঁর ভয়ঙ্কর অধিকার। একবার ভিতরে ঢুকতে পারলেই হয় কোনোরকম করে'। কিন্তু মিহির তুলে দিলে হাসির বেড়া, তাঁকে ফিরে আসতে হ'লো। সব চেয়ে যা খারাপ লাগে তা এই যে হাসির উপরে কোনো কথা চলে না। তা নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে হাস্যাস্পদ হ'তে হয় নিজেরই কাছে। নিজেকে তাঁর বিপর্য্যস্ত, ব্যর্থ মনে হ'লো।

থেকে-থেকে তিনি আসেন ছেলের কাছে, মৃণালের প্রসঙ্গ

নিয়ে : নতুন রকমের যে গুজরাতি সাড়ি বেরিয়েছে, মৃণালের জন্য তার একখানা কিনলে কেমন হয় ; বিয়েতে পাওয়া ছাইভস্ম দিশি প্রসাধনের জিনিস কি ব্যবহার করা ভালো ; শোবার ঘরে পরবার জন্য ওর মখমলের এক জোড়া চটি হ'লে বেশ হয় ; ওর আঙুলে নীলা-বসানো আংটি মানাবে বেশ। এমনি অনেক গায়ে-পড়া, জোর-করে'-পাড়া কথা। মিহির ধৈর্য্য ধরে' শুনতো, ক্ষীণ হাসি তার ঠোঁটে। রাখতো তার মায়ের কথা ; কিনে আনতো সাড়ি আর এসেন্স্ আর আংটি। অথচ, যে-কোনোরকম বাজার করতে চিরকাল তার বিশ্রী লেগেছে। তার গায়ের জামাও হৈমন্তী বাড়িতে দরজি ডাকিয়ে পুরোনো জামার মাপে তৈরি করাতেন—সে টেরও পেতো না। হৈমন্তী ঝড়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন ; হতাশ হলেন এমন প্রশান্ত বাধ্যতা দেখে। তিনি কেবলই চেষ্টা করতে লাগলেন ছেলের মনের মধ্যে উঁকি দিতে, তার কাছে আসতে, তাকে মুঠোর মধ্যে পেতে। বিশেষ সফল হলেন না, যদিও।

আর তিনি কেবলই খোঁচা দিতে লাগলেন—যদি একদিন সে সত্যি চটে' ওঠে, রাগের ঝোঁকে নিজেকে ধরা দিয়ে ফেলে। তিনি ঠিক সেই সব প্রস্তাব নিয়েই ছেলের কাছে যেতেন, যার সম্বন্ধে, তিনি জানেন, তার অনতিক্রম্য বিতৃষ্ণা। যেমন এক বিকেলে তিনি হয়-তো বললেন :

সূর্য্যমুখী

'এই, বঙ্কিমবাবুর কী-একটা বই ফিল্‌মে দেখাচ্ছে, ভালো হয়েছে নাকি খুব। মৃণাল দেখে আসুক না আজ।'

'নিশ্চয়ই। তুমিও যাও।'

'তা-ই ভাবছি। নিয়ে যাবে কে ?'

'নিয়ে আবার যাবে কে ? এখান থেকে এখানে যেতে পারবে না ? আমি না-হয় টিকিট এনে দিচ্ছি।'

'তুইও তো যেতে পারিস্।'

'অসম্ভব।

'অসম্ভব কেন ? চল্ না। মৃণালকে কাপড় পরতে বলি।'

'তা কাপড় তো পরতেই হবে।'

'তুইও তৈরি হ'য়ে নে।'

'আমি যাবো না। তুমি তো জানোই সিনেমা দেখতে আমি ভালোবাসি নে।'

'একদিন না-হয় গেলিই।'

'মরে' গেলেও আমি বাঙ্‌লা ছবি দেখবো না।'

'তা হ'লে আর আমাদেরও যাওয়া হয় না।'

'কেন ?'

'না, থাক্।'

'থাকবে কেন ? যাও না তোমরা।'

হৈমন্তীর প্রত্যেকটি কথায় হিসেব-করা স্নায়ু-পীড়ন। মিহিরের

দাঁতে দাঁত লেগে আসছে, তবু তাকে শান্ত হ'য়ে থাকতে হবে। ধৈর্য্যের পরীক্ষা, বলা যায়। দু'জনের প্রতিরোধশক্তির প্রচ্ছন্ন যুদ্ধ। কিন্তু মিহিরও হার মানবে না। এমন সে হ'তে দেবে না যে তার মা ফাঁকি দিয়ে তার উপর বাজি জিতে যাবেন। শেষ পর্য্যন্ত সে ধরে' থাকবে, নিজেকে টেনে রাখবে নিখুঁত মাত্রার মধ্যে: শেষ পর্য্যন্ত জিৎ হবে তারই।

তাই সে একটু পরে বললে: 'আমার জন্যই তোমাদের যাওয়া আটকে থাকবে কেন? চলো, আমিও না-হয় যাচ্ছি।'

হৈমন্তী তখন উল্টোদিক দিয়ে আক্রমণ করলেন: 'থাক, ইচ্ছে না-থাকলে গিয়ে কাজ নেই।'

'একদিন না-হয় দেখলুমই একটা বাঙলা ছবি।'

'দয়া করে' তোমায় যেতে হবে না।'

স্বাভাবিক অবস্থায় হ'লে কথাবার্ত্তা এতদূর এগোতো না: মিহির অনেক আগেই মা-কে চুপ করিয়ে দিতো। আর এখন, তার ইচ্ছে করছিলো চীৎকার করে' উঠতে, কিন্তু সে মৃদুস্বরে শুধু বললে:

'নিজের উপর দয়া করে'ই যেতে চাইনি।'

হৈমন্তী আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—ব্যর্থতার ছবি। ছেলের বিরুদ্ধে তাঁর মনের এই অস্পষ্ট, ব্যর্থ আক্রোশকে তিনি কী করে' সহ্য করবেন, কী করে' গোপন করবেন? আর

খানিক পরে, মিহির যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, হঠাৎ মৃণাল এসে বললে :

'তুমি কি বেরুচ্ছো ?'

'ভাবছিলুম একটু সিনেমায় যাবো—তোমরা যদি যাও।'

'তা হ'লে না গেলে। আমরা কেউ যাচ্ছিনে।'

'যাচ্ছো না ?'

'আজ তো নয়।'

'আচ্ছা তা হ'লে', মিহির আয়নার কাছ থেকে সরে' এলো। 'যেদিন যাবে আমাকে বোলো।'

সন্ধেবেলায়, হৈমন্তীর ঘরের জানলার ফাঁকে ধূপকাঠি জ্বেলে দিয়ে মৃণাল তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, 'মা, ওর যা ভালো লাগে না, কেন তুমি ওকে তা করতে বলো ?'

'ভালো না-লাগলে চলবে কেন ? ভালো লাগাতে হবে।'

'আমার তো কিছুরই দরকার নেই।

'কেবল দরকার বলে'ই বুঝি ? পুরুষমানুষকে খামকা মাঝে-মাঝে খাটিয়ে না নিলে ওদের মাথা ঠিক থাকবে কেন ?'

'কিন্তু ও-সব ঝঞ্ঝাট—ও তো ভালোবাসে না—'

'ভালোবাসে না ! ও কী ভালোবাসে শুনি ? যে-কাজ ভালোবাসি, তা তো নিজের গরজেই করতে পারি। সেটা আর বেশি কথা কী ? যা ভালোবাসি নে, তা কেবল তার জন্যেই

করতে পারি, যাকে ভালোবাসি। পুরুষমানুষ বৌয়ের জন্ত একটু ঝঞ্ঝাট সইবে না? তা কি হয়? না, হ'লেই ভালো দেখায়?'

মৃণাল আর-কিছু বললে না, মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার গলার নীরব, নরম একটু রেখা হৈমন্তীর চোখে পড়লো, আর হঠাৎ তাঁর মনের মধ্যে একটা সন্দেহ, একটা আশঙ্কা, ভয়—বুঝি তিনি ভুল করেছেন, বুঝি তিনি ভুল করেছেন। ভয়ে তাঁর রক্ত যেন শুকিয়ে গেলো। আর সেই ভয় তাঁকে হানা দিতে লাগলো, তাঁর বিশ্রামে, তাঁর আরামে, তাঁর ঘুমে। তাঁর সমস্ত চিন্তায়, তাঁর শান্তিতে, তাঁর নির্জ্জনতায়। তিনি লক্ষ্য করলেন, তিনি লক্ষ্য করা ছেড়ে দিলেন। তিনি মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন, তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন। তিনি ছোটখাটো কথা থেকে গভীর ইঙ্গিত বা'র করবার চেষ্টা করলেন, চেষ্টা করলেন নীরবতার অন্তর্লীন স্বরকে ধরতে। কিন্তু কিছুতেই কোনো মীমাংসায় পৌছতে পারলেন না।

৫

এমনি করে' কাটলো বর্ষা—বাঙ্‌লাদেশের এলোমেলো উতরোল উদ্‌ভ্রান্ত বর্ষা, বিরতিহীন, তৃপ্তিহীন; খেয়ালে ভরা, চঞ্চলতায় ভরা; বৃষ্টি ঝরিয়ে-দেয়া, রোদ ছড়িয়ে-দেয়া; আকাশ নীলের আর ধূসরের জোড়াতালি; আর্দ্র অন্ধকার আর কঠিন, শ্বেত দীপ্তির টানা-পোড়েন; চাপা কান্নার মত রাত; রাত্রির মত রুদ্ধশ্বাস, মেঘের দুপুর; অজস্র, প্রগল্‌ভ, অশান্ত; হঠাৎ লুটিয়ে-পড়া, সন্ধ্যার দিগন্তে রঙে-রঙে জ্বলে'-ওঠা; রাত্রির পথে-পথে নিঃসঙ্গ কুকুরের মত কঁকিয়ে-ওঠা হাওয়া; মোহময়, বিরহময়, ক্লান্তিকর, অসহনীয়—আমাদের বাঙ্‌লাদেশের বর্ষা। আর সেবার তা আশ্বিনে ভেঙে পড়লো, ঢেউ খেলিয়ে গেলো আশ্বিন ভরে', নষ্ট করে' দিলে বাঙ্‌লার বিখ্যাত আশ্বিনকে। তা হাঁপিয়ে পড়লো, খাবি খেতে লাগলো, ফুরিয়ে এলো, ফিকে হ'য়ে এলো, তবু সে ছাড়বে না; তবু পূর্ণিমার জন্য ভরে'-ভরে'-ওঠা পুজোর চাঁদের মুখ সে শিঙ-তোলা মেঘের গুঁতোয় ভেঙে-ভেঙে দিতে লাগলো। পূজোর দিনগুলো ভরে' ছোট-ছোট পশলা, রাত্রে জ্যোছনার বন্যা থেকে-থেকে কালো হ'য়ে আসে, যেন একটা ঘোমটা পড়ে সৃষ্টির মুখের উপর: আর পূর্ণিমার পরে কৃষ্ণপক্ষ যখন এলো, হঠাৎ আবার শ্রাবণ এলো ঘনিয়ে—মনে হ'লো এ-বৃষ্টি আর কখনো থামবে না।

সূর্য্যমুখী

মাঝরাতে হঠাৎ নামলো বৃষ্টি। তুমুল স্রোতে তা নেমে এলো, কেউ যেন কোনো জিনিস ছুঁড়ে ফেললে স্বর্গ থেকে, যেন আকাশের একটা টুকরো চৌচির হ'য়ে ফেটে গেলো। রাত্রির সহরের যত অদ্ভুত মিশ্রিত শব্দ, জন্তুর আর যানের, কণ্ঠের আর ধাতুর, সব যেন মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো; রইলো শুধু বৃষ্টির শব্দ, মসৃণ নিবিড় একটানা বৃষ্টি, রাত্রি ভরে', আকাশ ভরে; সমস্ত বিশ্ব, সমস্ত সময় ভরে'। বৃষ্টির ছাট এসে লাগলো মিহিরের আনত মুখে, অপরিসীম-সূক্ষ্ম কোনো আঙুলের আদরের মত। যেখানে সে বসে' ছিলো টেবিলের উপর কনুয়ের ভর রেখে, সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে সে সার্সি বন্ধ' করে' দিলে। কেউ যেন বৃষ্টির মুখ চেপে ধরলে। কিন্তু তা ছটফট করছে, কাৎরাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, কৌশলে কোণঠাসা কোনো বন্য জন্তুর মত। তা পোষ মানবে না কিছুতেই। মিহিরের জানলার বাইরে তা মাথা কুটে মরছে। সমস্ত আকাশ কাঁপছে তার বিলাপে। নরম, নিরবচ্ছিন্ন এক শব্দ, কোণ-ঠাসা জন্তুর শ্রান্তিহীন দীর্ঘশ্বাসের মত, চেতনার খোলসকে যা দীর্ণ করে' যায়, মস্তিষ্ককে যা আচ্ছন্ন করে অনির্দ্দেশ্য, অজ্ঞাত-উৎস কোনো সুগন্ধের মত। তা বিষণ্ণতায় ভরা, নিঃসঙ্গতায় ভরা। মানুষকে তা নিয়ে যায় স্মৃতি-অতীত সেই অন্ধকারে, যখন আদিম অরণ্যের গুহায় বসে' বিশাল পল্লবের ফাঁক দিয়ে মানুষ আকাশের তারা লক্ষ্য করেছে—আর রাত্রি ভরে' গেছে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে তার নিঃসঙ্গতায় চেতনায়।

সূর্য্যমুখী

মিহির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তার মন বসবে না কিছুতে। হঠাৎ তার মনে সেই আদিম নিঃসঙ্গতা-বোধ। বৃষ্টি স্পর্শ করেছে তার আত্মাকে, বৃষ্টি প্রবেশ করেছে তার আত্মার মূলে। এই রাত্রির মত বিশাল অস্পষ্ট অন্ধকার বিষাদে সে আচ্ছন্ন। কী যেন নেই, কী যেন নেই। কোনো সময়ে, কোনো রাত্রির অরণ্যে সে তারার দিকে তাকিয়েছিলো—আজ তার মন ভরে' উঠেছে সেই তারা-বিরহে। ঘরের চারদিকে সে তাকালো: আধো-অন্ধকারে রেখায়িত তার শয্যা, দেয়ালের উপর আড়-হ'য়ে-পড়া ছায়ার পরদা—আর তার মনে যেন ভীষণ আদিম অরণ্য মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠলো। সে যা অনুভব করলে তা অনেকটা আতঙ্কের মত—নিঃসঙ্গ জন্তুর আতঙ্ক। তার যেন ভয় করতে লাগলো—রাত্রির এই অপস্মৃত, দীর্ঘনিঃশ্বসিত জগতকে ভয়। টেবল্ ল্যাম্পের চাবিটা সে ঘুরিয়ে দিলে। ঘরের অন্ধকার ভরে' বৃষ্টির শব্দ, যেন এক প্রেত-স্বর কেবলই কী কইতে চাইছে—কইতে পারছে না। কোনোখানে এক ফোঁটা আলো নেই। চোখে না-দেখেও সে বুঝতে পারলে বাইরের ঠাসা কালো আকাশ—আস্ত একটা পাথরের মত। সে ভাবতে পারলে না রাস্তায় একটা আলো আছে, কোনো বাড়ির কোনো জানলায় একটু আলোর রেখা। সমস্ত ডুবে গেছে, সমস্ত হারিয়ে গেছে, শুধু এই অবিশ্রান্ত নিরবয়ব শব্দ। অন্ধকারের মধ্যে সুড়সুড় করে' সে বিছানায় গিয়ে

শুলো, গুহার মধ্যে কোনো ক্লান্ত জন্তুর মত। বালিশের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে দিয়ে সে চোথ বুজলো। আর ঐ তো—বৃষ্টি বাজছে তার রক্তে দপদপ করে', ধ্বনিত হচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডে। বৃষ্টি, বৃষ্টি! চিরন্তন অন্ধকারে চিরন্তন বৃষ্টি। সৃষ্টির শেষ দিনের মত, প্রলয়ের মত। আর তার ভয় করছে, একা থাকতে তার ভয় করছে। একা থাকার মানে কী, এর আগে সে যেন কখনো জানেনি। যা-কিছু একদিন তাকে আশ্রয় দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে, বিশ্বাস দিয়েছে—সব এই রাত্রির চাপে চূর্ণিত। তার নগ্ন নিঃসঙ্গ, মনোহীন এই সত্তা—সে কখনো নিজেকে এ-রকম করে' ভাবতে পারেনি। তার চামড়ার নিচে, তার মাংসের অভ্যন্তরে তা লুকিয়ে ছিলো এতদিন—এতদিন ধরে'। দিন আর রাত্রির স্রোত তার উপর দিয়ে ভেসে গেছে, এঁকে দিয়ে গেছে ছবি, ভাবনার রঙে আর রেখায়—এতকাল সেই ছবিটাই ছিলো। হঠাৎ রাত্রির ঝোপের আড়াল থেকে কী লাফিয়ে পড়লো তার উপর, কী নেমে এলো তার উপর—কিছু যেন ছিঁড়ে গেলো, টুকরো হ'য়ে গেলো—আর এই তো সে জড়োসড়ো হ'য়ে শুয়ে আছে ভীত পশুর মত, অন্তহীন রাত্রি গড়িয়ে যাচ্ছে তার উপর দিয়ে।

মিহির বেশিক্ষণ চোথ বুজে থাকতে পারলে না। চোথ বুজে থাকবার এই চেষ্টা, তা-ও যেন সহ্য হয় না। সে তাকিয়ে রইলো অন্ধকারের মধ্যে; শুনতে লাগলো বৃষ্টির অন্তহীন শব্দ। আ—

কিছু নেই, সমস্ত পৃথিবীতে এছাড়া আর-কিছু নেই। এখানে সময়ের সীমা। এর মধ্যে একা থাকা—এই রাত্রিতে, এই অন্ধকারে! যেন একটা ঠাণ্ডা তার মেরুদণ্ড বেয়ে-বেয়ে উঠছে। সে কেঁপে উঠলো। এই রাত্রি চেপে বসেছে সময়ের বুকের উপর সর্ব্বব্যাপী দৈত্যের মত; সময় থেকে সে স্খলিত হ'য়ে পড়ছে। এ-সময়ে কোনো আশ্রয়, কোনো সংস্পর্শ—যা দিয়ে সে জানতে পারবে সে আছে। ঠাণ্ডায় তার শরীর যেন জল হয়ে আসছে; তার কান, তার মন, তার সমস্ত সত্তা যেন বৃষ্টিময়। এই ঠাণ্ডা সে আর সইতে পারে না, এই ভয়। আর, যে-জন্তু উত্তাপ চায়, তার মত সে এগিয়ে গেলো সামনের দিয়ে, গুঁড়িসুড়ি হ'য়ে। সেই ঠাণ্ডা বিশাল শয্যা নিয়তির প্রসারের মত তার শরীরের নিচে। সে তা পার হ'য়ে এলো, সে হাত বাড়িয়ে দিলে অন্ধকারে। আর হঠাৎ এই সীমাহীন রাত্রির মধ্যে এ কী, এই উত্তাপের দ্বীপ! মিহিরের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চে উন্মাদ হ'য়ে উঠলো।

মৃণাল কি ঘুমিয়ে ছিলো? মৃণাল কি অপেক্ষা করে' ছিলো? কিন্তু সে-ও অন্ধকারের মধ্যে চোখ খুললো; অন্ধকারের মধ্যে দু'জনের অন্ধ চোখ। আর মিহির মিশে গেলো, মিলিয়ে গেলো, মগ্ন হ'য়ে গেলো মৃণালের মধ্যে। নিজেকে সে ভরে তুললো মৃণালকে দিয়ে। মৃণাল অনুপ্ত, প্রগাঢ় স্রোতে তার মধ্যে সঞ্চারিত, মৃণালের উত্তাপ তার গোপন সূর্য্য, গোলাপের মধ্যে নিহিত

অন্ধকার, উজ্জ্বল সূর্য্য। আর সেই উষ্ণতা মিহিরের জঠরের স্নায়ুকেন্দ্রে, তার রক্তের মধ্যে কোনো জ্বলন্ত বিষের মত। প্রত্যেকটি অঙ্গুলিপ্রান্তে সে বিদ্যুৎময়। অন্ধকার ভরে' বিদ্যুৎস্রোতে, এক সম্পূর্ণ বিদ্যুৎবৃত্তে তাদের রক্ত প্রবাহিত। মিহির শোষণ করে' নিলে মৃণালকে, তাকে নিঃশেষে নিঙ্‌ড়ে নিলে নিজের মধ্যে, যতক্ষণ না অন্ধকার সূর্য্য ঝরে'-ঝরে' পড়লো পাপড়ির পর পাপড়িতে, রাত্রিকে জাগিয়ে তুলে; যতক্ষণ না সমস্ত রাত্রি মর্ম্মে-মর্ম্মে, তন্তুতে-তন্তুতে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠলো।

আর পরের দিন সকালে আকাশ রোদে-ঝলোমলো। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মিহির দেখতে পেলো সেই আশ্চর্য্য আকাশ। আর হঠাৎ কোথা থেকে একটা তিক্ততার ঢেউ তার গলা পর্য্যন্ত ঠেলে উঠলো। না, এ সে চায়নি, এর জন্য তার রাত্রি প্রস্তুত ছিলো না। এ ফাঁকি, ফাঁকি। মৃণাল তাকে ফাঁকি দিয়েছে, নিজেকে সে ফাঁকি দিয়েছে। ঘৃণায় নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠলো তার মন। মৃণাল তাকে নিয়েছে—কোনো কৌশলে, কোনো শঠতায়। সে কী বোকা—নিজেকে এমনি দীর্ণ করতে গেলো—দু'টুকরো করতে গেলো—তা শারীরিক অঙ্গচ্ছেদেরই মত; নিজেকে তার মনে হ'লো বিকল, বিপর্য্যস্ত, অবমানিত। নিজেকে সে দু'টুকরো করে' কেটেছে, যাতে একজন স্ত্রীলোক মনে-মনে বলতে পারে: 'সে আমার।' তুমি আমার! তুমি আমার! সব চেয়ে

ঘৃণিত কথা, কলুষিত, কলুষ্কর; যা শুনলে প্রবল বিতৃষ্ণায় শরীর শিরশির করে' ওঠে। কী করে' সে একজন স্ত্রীলোকের হাতের খেলায় ধরা পড়ে' গেলো! রাত্রির কিছুই তার ভালো করে' মনে পড়ছিলো না; কিন্তু তার বিতৃষ্ণার নেশায় সে পরম অপরাধী করে' তুললো মৃণালকে। তাকে ঘৃণা করে'—যা একদিন সে কখনো করেনি—সে প্রতিশোধ নিলে নিজের আত্ম-বিভেদের, নিজের পরাজয়ের। কেননা এতে কোনো দীপ্তি নেই, কোনো ঐশ্বর্য্য নেই। এর কোনো মানে হয় না। এতে কেবলই ক্ষয়, কেবলই বিকৃতি, নিজেকে দু'টুকরো করে' ছিঁড়ে ফেলা। এর কোনো মানে হয় না। মিহিরের মনে হ'তে লাগলো তার আত্মার একটা অংশ সে হারিয়ে ফেলেছে—বিকিয়ে দিয়েছে, মৃণালের কাছে।

সারাদিন সে মৃণালের মুখের দিকে তাকাতে পারলো না। সে ঘৃণা করলো তার শান্ততা, সমস্ত বাড়ি ভরে' তার নিঃশব্দ নৈপুণ্য। তার মধ্যে সে আজ একটা নতুন আত্মস্থতা দেখতে পেলো: তার এই নীরব নিখুঁত নৈপুণ্য; প্রশ্নহীন, নিঃসঙ্কোচ বাধ্যতা—তা-ই যেন মিহিরকে সব চেয়ে বড় অপমান। সে বহন করছে একটা গোপনতা, তার নিষ্ঠুর, অনস্বীকার্য্য স্ত্রীত্ব। সে-ই তার চরম শক্তি, রাত্রি যার উৎস। সারাদিন ভরে নিজেকে অপসৃত করে রাখলেও তার কিছু এসে যায় না। রাত্রি আছে তার।

মিহিরের আত্মার একটা অংশ সে দখল করে' নিয়েছে—আর এদিকে ছাখো, পোষা বিড়ালের মত সে শান্ত, ছাখো তার অদ্ভুত নিখুঁত নৈপুণ্য !

তবু সেই রাত্রে মিহির তার প্রতিহিংসা নিলে। মৃণালকে অপমান করে', তার শরীরের ভিতর দিয়ে তার আত্মাকে অপমান করে'। ঘৃণার উল্লাসে সে তাকে স্পর্শ করলে। তাকে মুহ্যমান করে' দিলে তার ঘৃণার উত্তাপে। সে উজাড় করে' দিলে তার জীবন্ত, জ্বলন্ত ঘৃণা—মৃণালকে তা পেঁচিয়ে ধরলো চারদিক থেকে কোনো বিষাক্ত, নীল আগুনের মত। সে তাকে অপমান করলে, ছারখার করে' দিলে। নিজের স্বভাবের উপর এই ভয়াবহ অত্যাচারে সে প্রায় মরে' গেলো : তবু, নিজেকেও সে দয়া করলে না।

আর পরের দিন বিতৃষ্ণা, নিজের উপর প্রচণ্ড ঘৃণা। আর যেহেতু সে-ঘৃণার কারণ মৃণাল, তার উপর তীব্রতরো ঘৃণা। তার ফলে আবার প্রতিহিংসা। এমনি করে' চললো—বিষাক্ত, অন্তহীন চক্রে। একটা ঘূর্ণ্যমান চাকা হঠাৎ তাকে ধরে' ফেলেছে কেবলই ঘুরে চলেছে, তাকে চূর্ণ করে', নিষ্পেষিত করে'। সুদূর, অজ্ঞাত দেবতার কাছে মিহির প্রার্থনা করলো মুক্তির জন্য। কিন্তু প্রার্থনার স্বর রাত্রির বুকের উপর মরে' গেলো। তার নিজের মাংসই যে অবাধ্য, বিদ্রোহী। তার নিজের রক্ত ফেনিল হ'য়ে

উঠলো তার বিরুদ্ধে। এই আত্মদ্রোহে . ছিন্ন, দ্বিখণ্ডিত, সে মুখ থুবড়ে পড়লো হতাশার চোরাবালিতে, স্পন্দমান, অসহায়, শক্তিহীন। নিজেকে সে ঘৃণা করতে লাগলো—ওঃ, নিজের প্রতি ঘৃণায় সে পাগল হ'য়ে গেলো। আর সেই ঘৃণার বিশুদ্ধতম নির্য্যাস তাকে ঢেলে দিতে হবে মৃণালের উপর—বিষের মত, সূক্ষ্ম মৃত্যুর মত—তা না হ'লে সে বাঁচবে না।

৬

যুদ্ধ চললো। কিন্তু একপক্ষের যুদ্ধ ; একপক্ষের আক্রমণ ও পরাজয়। অন্য পক্ষ—তার কথা কিছু বলবার নেই। মৃণাল কি জানতো তার স্বামীর মন ? সে কি বুঝতো মিহির তাকে অপমান করছে ? অপমানে, প্রতিহিংসায় তাকে ছারখার করে' দিচ্ছে ? এটা কি সে ভাবতে পারতো যে বিভিন্ন—এমন কি সম্পূর্ণ বিরোধী ভাব বাইরে ফলে' ওঠে একই রূপ নিয়ে। নিবিড় শরীরকে ভেদ করে' সে কি কখনো ভিতরে উঁকি দিতে পারতো ?

কেমন করে' পারবে ? তার শুধু শরীর ছিলো, সে এসেছিলো শুধু তার শরীর নিয়ে। তার শরীরের সংস্পর্শ আর অনুভূতি—তা-ই তার কাছে চরম। তার জগতে এর বাইরে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কেবল শারীরিক প্রতিক্রিয়া দিয়েই সে একটা জিনিস বুঝতে পারে। শরীর যেখানে জ্বলে' ওঠে, ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে, সেখানে সে আর-কোনো প্রশ্ন করে না। শরীর দিয়ে সে যেটুকু পায়, যা-কিছু পায়, তা-ই তার কাছে ঐশ্বর্য্য, সব তার কাছে একমূল্য। শরীরের সীমায় সে আবদ্ধ, শরীর ছাড়িয়ে সে দেখতে পারে না।

না, মৃণাল কিছু দেখতে পেলে না। শুধু, তার অর্দ্ধ-চেতন পশু-সত্তায় সে সুখে আপ্লুত হ'য়ে গেলো। ঢেউয়ের মত সে ভেঙে পড়লো, ঢেউয়ের মত সে লুটিয়ে পড়লো। ফুটে উঠলো তার

অন্ধকার সূর্য্য, রক্তের স্রোতে ছড়িয়ে পড়লো সূর্য্যের ঐশ্বর্য্য। সে নতুন হ'য়ে উঠলো; অন্ধকারের দীপ্তিতে সে উদ্ভাসিত, রূপান্তরিত। সে সুখে ভরে' উঠলো—তার অর্দ্ধ-চেতন পশু-সুখে। নিজের ভিতরে তার এক আশ্চর্য্য উন্মীলন—সৌন্দর্য্যে, উত্তাপে, আনন্দে। স্ত্রীলোক এত সুন্দর হ'য়ে ওঠে কেবল এক কারণে। কী তার নাম দেবো? ভালোবাসা? কিন্তু মিহিরের ভালোবাসা তো তা নয়। তবু তা-ই তাকে বলতে হয়। কেননা কথা একটাই আছে, যদিও ভাব অনেক। ভালোবাসা বলতে এক-একজন এক-একরকম বোঝে: কিন্তু প্রত্যেকেই ব্যবহার করে সেই এক কথা। পৃথিবীতে সৈন্যের ভালোবাসা আছে, আর ধনী বণিকের, ক্লান্ত নাগরিকের আর কল্পনাবিলাসীর, ভীরু কুমারীর, অভিজাত গণিকার, কবির, তরুণ ছাত্রের—সহজেই এ-তালিকা দীর্ঘ করা যায়। প্রত্যেকেই ভালোবাসে, ভালোবাসা চায়: কিন্তু অভিজ্ঞতার সমষ্টি হিসেবে একটা আর-একটার অনেক দূরে; যত দূরে শেলির কবিতা পড়া আর জুয়ো খেলায় জেতা; যত দূরে অজানা, বিশাল সমুদ্রে নৌকো নিয়ে ভেসে পড়া আর মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে' মাসিকপত্রের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে ঘুমিয়ে পড়া। বিভিন্ন, বিপরীত, পরস্পর-বিরোধী নানা জিনিসের জন্য আমাদের একই নাম। সেইজন্য এত কষ্ট হয় আমার কথা আর-একজনকে বোঝাতে। ভালোবাসা সম্বন্ধে

সূর্য্যমুখী

আমাদের প্রত্যেকের মনেই একটা বিশেষ নক্সা আছে : সেখানে যার সঙ্গে মেলে না, তার কাছে আমরা বরফ। মিহিরের যে-নক্সা, মৃণালের তা নয়। মৃণালের নিজের নক্সার সঙ্গে যেটা মিলেছে, সেটাতে সে সুখী। মিহির তা বুঝতে পারে না; কি বুঝতে পারলেও মর্ম্মমূলে আহত হবে।

কিন্তু মিহির বোঝে কি না-বোঝে, মৃণালের তাতে কিছু এসে যায় না। সে নিজেই বোঝে না। সে জানে না তার নিজের উন্মীলন। শুধু তার রক্তের মধ্যে একটা উজ্জীবন; সমস্ত শরীরে বসন্তের মত নতুন হ'য়ে ওঠা—আর-কিছু নয়। ভাববার জন্য মুহূর্ত্তকাল সে থমকে দাঁড়াতো না। একবার আয়নার সামনে অকারণে এসে দাঁড়াতো না—কী সুন্দর সে হ'য়ে উঠেছে, তা দেখতে। শুধু সে নিজেকে ছেড়ে দিলে অন্ধকার, উষ্ণ সেই রাত্রির স্রোতে। শুধু সে ভরে' উঠলো অন্ধকার, জ্বলন্ত সূর্য্যে।

কিন্তু হৈমন্তী লক্ষ্য করলেন। তাঁর চোখে ধরা পড়লো মৃণালের উন্মীলন। এ-সব জিনিস স্ত্রীলোকের দৃষ্টি কখনো এড়াতে পারে না। কোনো নবীন স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়েই তারা বলে' দিতে পারে—বুঝতে পারে। মৃণালের দিকে তাকিয়ে হৈমন্তী শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। আর ভয় নেই। [illegible]

৭

অঘ্রান মাস পড়লো। বাতাসে শীতের আমেজ। আকাশ নীল। আলস্যে আর উষ্ণতায় মধুর-হ'য়ে-ওঠা সকালবেলা। কলকাতায় এরই মধ্যে ক্রিসমাসের উৎসব-গুঞ্জনের প্রথম সূচনা। কাজ না-করবার সময়, অলস ভাবনার সময়, নিজের মনের মধ্যে অকারণে খুসি হ'য়ে ওঠবার সময়।

এই সময়ে মিহিরের সঙ্গে তাপসী দেবীর আলাপ হ'লো। পল্লব বলে' এক ছেলেদের কাগজে মিহির মাঝে-মাঝে লিখতো, তাপসী দেবী তার সম্পাদক। তার লেখা পেয়ে সম্পাদক খুসি হ'তেন, সে খুসি হ'তো পল্লবে লিখে। কেননা পল্লবের ছিলো বিশেষ একটা সুর, একটু যেন স্বপ্নময়—পলাতক ছায়ার মত, মেয়ে-মনের সূক্ষ্ম-সঞ্চারী সুর। পল্লব পড়তে মিহিরের ভালো লাগতো। অবিশ্যি ছেলেদের যে-কোনো কাগজই সে পেলেই পড়তো—কেননা এ-বিষয়ে তার সন্দেহ ছিলো না যে বাঙলাদেশে তথাকথিত বয়স্ক লোকদের জন্য যে-সব কাগজ বেরোয় তার একটাও পড়বার মত নয়। অন্তত বয়স্ক লোকের পড়বার মত নয়।

তাপসী দেবী নিজেও কবিতা লিখতেন—ছোট-ছোট ছবি, একটু ঝাপসা, যেন পাৎলা কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা। অলস তার ছন্দ, নরম তার রঙ। মোমের আলোর মত নরম, চোখের

উপর জড়িয়ে-আসা ঘুমের মত। খানিকটা ক্রিস্টিনা রসেটির মত—যখন তাঁর মন ভালো থাকতো না। মিহিরের সে-সব কবিতা ভালো লাগতো। আর সে-ভালো-লাগা অবিশ্যি পারস্পরিক। (এটা কেন হয় যে দু'জনের যখন পরস্পরের লেখা ভালো লাগে এবং সে-কথা তারা প্রকাশ করে, লোকে তাদের ঠাট্টা ক'রে বলে—মিউচুয়ল অ্যাডমিরেশন সোসাইটি? তাতে ঠাট্টা করবার কী আছে? তা হ'লেই তো সব চেয়ে ভালো। অ্যাডমিরেশন যদি মিউচুয়ল না হয়, সেটাই তো ভয়ঙ্কর মারাত্মক।) পারস্পরিক—এবং উচ্চারিত। মাঝে-মাঝে তারা পত্রবিনিময় করতো—পল্লব উপলক্ষ্য ক'রে। তাপসী দেবীর হাতের লেখা ছোট-ছোট, লতানো; এক-একটা লাইন এক-একটা কৃশ, কালো সাপের মত। কোনো চিঠিতে তিনি হয়-তো লিখতেন: 'একদিন আসুন না আমাদের এদিকে—যদি সময় করতে পারেন।' মিহির লিখতো উত্তরে: 'চেষ্টা করবো।' কিন্তু যাওয়া তার কখনো হয়নি, যেতে তার ইচ্ছাই করেনি। হয়-তো তার ভয় হয়েছে পাছে তাপসীকে তার ভালো না লাগে—পাছে বড় বেশি ভালো লেগে যায়।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত, প্রায় দু'বছরের কাগজের আলাপের পর তাদের দেখা হ'লো। তাপসীর সম্বন্ধে মিহির কিছুই জানতো না। সেই সন্ধ্যায়, নিজকে পার্ক সার্কাসের এক ছোট, একতলা বাড়ির সামনে দেখতে পেয়ে সে হঠাৎ অবাক হ'য়ে গেলো। পল্লব

আপিসের এই ঠিকানা। কিন্তু মোটেও আপিসের মত দেখতে নয়—তা তো নয়ই। এটা তাদের থাকবার বাড়ি—সে এখানে নিমন্ত্রিত। অবিশ্যি পল্লবের উপলক্ষ্যেই নিমন্ত্রিত। পল্লবের পাঁচবছর পূর্ণ হ'লো—সেইজন্য ছোট একটা—কী বলে ওকে ?—প্রীতি-সম্মেলন। কী কুৎসিত কথা, শোনামাত্র সমস্ত প্রীতির ভাব উবে যায়।

হয়-তো সে না এলেই ভালো করতো। ঘরে আলো জ্বলছে, শোনা যাচ্ছে কথা। হয়-তো অনেক লোক এসেছে, হয়-তো দু'মিনিটেই সে হাঁপিয়ে উঠবে, তার ভালো লাগবে না। কী করে' তার মাথায় এটা ঢুকলো যে আসতে হবে ? কিন্তু তাপসী এত সুন্দর করে' চিঠি লিখেছিলো। সে-ও তো পারতো তার চেয়েও সুন্দর করে' লিখে জবাব দিতে। সত্যি বলতে, এখানে তার উপস্থিতির চাইতে সেই চিঠি অনেক বেশি ভালো শোনাতো—ও দেখাতো।

ফটকের গায়ে যেখানে বাড়ির নম্বর লেখা, সেদিকে ঝুঁকে সে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় তার পিছনে একটা কণ্ঠস্বর শুনলে : 'হ্যাঁ, এই বাড়ি। আসুন।'

ফিরে তাকিয়ে সে দেখলো, বছর আঠারোর একটি ছিপছিপে ফর্সা ছেলে। সে তার চোখের দিকে তাকাতেই ছেলেটি হেসে বললে : 'আমি আপনাকে চিনি। আসুন।'

সূর্য্যমুখী

তাপসীর ভাই—নিশ্চয়ই। এই ভাই আর মা-কে নিয়ে সে থাকে এই বাড়িতে। বাপ ছিলেন রানিগঞ্জে কয়লা-খনির ইঞ্জিনিয়ার। অল্প বয়েসে ভদ্রলোক মারা যায়। তাপসীর তখন পনেরো বছর। তারা চলে' আসে কলকাতায়—আর কোথাও যাদের থাকবার জায়গা নেই, তাদের থাকবার একমাত্র জায়গা। কিছু পয়সা ছিলো: দুর্ভাবনার কোনো কারণ ছিলো না। রানিগঞ্জে কোনো সমাজ নেই: কোনো সামাজিকতার ছকের মধ্যে তার বাল্যের লালন হয়নি। শিশুকাল থেকে কলকাতার আওতায় যে-সব মেয়ে মানুষ, তাদের থেকে সে খানিকটা অন্যরকম হ'তে বাধ্য। যাকে বলে কোণগুলো ঘষে' সমান করে' দেয়া, তার জীবনে তা ঘটতে পারেনি। ইস্কুলে না-গিয়ে, গান না-শিখে, অটোগ্রাফ সংগ্রহ না-করে', সিনেমালোকের দেবদেবীর পূজো না-করে' সে তার পনেরো বছর পূর্ণ করেছিলো। কোনো গণ-মনোভাব ছেলেবেলা থেকে তার মনকে 'তৈরি' করেনি। পনেরো বছরে, অনেক জায়গায় সে কাঁচা, অনেক জায়গায় সে অস্বাভাবিকরকম গভীর। তার মধ্যে অনেক কোণ, অনেক আঁকাবাঁকা। কিছু এলোমেলো, অগোছাল তার স্বভাব, বর্ষার হাওয়ার মত। বর্ষার মেঘের মত তার মনের অসংলগ্ন রঙিন মুহূর্ত্ত, পরম্পরাহীন। যেমন খুশি সে হ'য়ে উঠেছে নিজের স্বভাবেরই গরজে, পশ্চিমের

সূর্য্যমুখী

মাছরাঙা-আকাশের নিচে ধূসর, ঢেউখেলানো প্রান্তরের মাঝখানে।

বই সে ভালোবাসতো। কলকাতা থেকে মাসিকপত্র আসবে—উন্মাদের মত সে তার প্রতীক্ষা করতো। তার নামেই আসতো সব কাগজ—প্রতিটি মোড়ক তার নিজের হাতে খোলা চাই। প্রতিটি কাগজের বিশেষ একটা রূপ ছিলো তার মনে, নিজস্ব একটা গন্ধ—যা ভুল করা যায় না। সাহিত্য আর ভারতী, সবুজপত্র আর নারায়ণের ভিতর দিয়ে সে বড় হ'য়ে উঠলো। ও-সব কাগজ সে বুঝে পড়তো, না-বুঝে পড়তো, মনে-মনে যা-হোক একরকম ভেবে নিয়ে পড়তো—সে ভালোবাসতো কথাগুলো। তারপর এলো বাঙলা মাসিক সাহিত্যের বাজারে যুগ—বিরাট বপু আর রঙিন ছবির, চারটে করে' ধারাবাহিক উপন্যাস আর দশটা করে' ছোট গল্পের, সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী আর বিভিন্ন ভাষার বিস্তর উদ্ধৃতি-বহুল প্রবন্ধের যুগ। সে-সময়ে তাপসী অনেকটা বুঝে পড়তে শিখলো, কিন্তু তখন আর বাঙলা মাসিক সাহিত্যে বুঝে পড়বার মত বিশেষ-কিছু নেই।

এত পড়লে লেখবার জন্য হাত চুলকোবেই। রানিগঞ্জে থাকতে তাপসী সমানে দেড় বছর হাতে-লেখা এক কাগজ চালিয়েছিলো—তার নাম কাজল। তার মা নামকরণ করেছিলেন, তার বাবা প্রথম সংখ্যায় কাজল ও কয়লা নামে প্রবন্ধ লিখে-

ছিলেন। একটা পারিবারিক পত্রিকা হ'য়ে উঠবে, এমন লক্ষণ দেখা গিয়েছিলো। সাত বছরের চারণ আঁকতো ছবি। কিন্তু দু' একমাস যেতেই দেখা গেলো মা আর বাবা কাজলের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ একটি মানুষের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। এমন কি, চারণের ব্যবহার দেখেও মনে হয় না কাজলের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করাই তার জীবনের প্রধান আনন্দ। কিন্তু কাজল চলতে লাগলো —প্রতি মাসের ঠিক পয়লা তারিখে একটি করে' সংখ্যা বেরোয়— তাতে গল্প থাকে, কবিতা থাকে, ধারাবাহিক উপন্যাস থাকে, প্রবন্ধ থাকে, সুরেশ সমাজপতির ঢঙে মাসিক সাহিত্যের সমালোচনা থাকে, এমন কি, বিজ্ঞাপন থাকে। (তাপসীর জীবনের প্রথম মোহ-ভঙ্গ হয়, যখন সে জেনেছিলো যে বিজ্ঞাপনগুলো কাগজওয়ালারা কাগজের সৌষ্ঠবের জন্য নিজেরা ভালো করে' লিখে ছেপে দেন না, বরং তা ছাপাবার জন্য ইঞ্চি মেপে পয়সা আদায় করেন।) সে-সমস্ত লেখা তাপসীর নিজের : একঘেয়েমি এড়াবার জন্য তাকে আটটা ছদ্মনাম উদ্ভাবন করতে হয়েছিলো। মাঝে-মাঝে যখন তার কোনো বন্ধুর কোনো লেখা বেরুতো, সেই বন্ধুর মা-বাবা তা বিশ্বাস করতে চাইতেন না : বলতেন, 'তাপসীই তোদের নামে লিখে দিয়েছে।' পাড়ার মধ্যে কয়েকটি বাড়ির মধ্যে কাগজের প্রচার। কোনো মহিলা তাদের বাড়ি বেড়াতে এসে তাপসীকে হয়-তো জিজ্ঞেস করতেন :

সূর্য্যমুখী

'কী গো, তোমার আষাঢ় সংখ্যার কদ্দূর ?'

আর তাপসী উত্তর দিতো :

'এই তো, মাসিক সাহিত্যটা শুধু বাকি, পয়লা তারিখেই বেরিয়ে যাবে।'

কি, তার বাবার কোনো বন্ধু তার কাছে এসে মুখ কাঁচুমাচু করে' বলতেন :

'আমার একটা লেখা আছে—তোমার কাগজে কি চলবে ?'

আর সে, গম্ভীরভাবে :

'রেখে যান। টিকিট দেয়া থাকলে ফেরৎ দেয়া হবে।'

ভীষণ মজা—অনেক নাম দিয়ে অনেক জিনিস লেখা। এমন উত্তেজনা আর কোন্ খেলায় ? আর কোন্ খেলায় এমন সারাক্ষণ ডুবে থাকা যায় ? চারদিক থেকে অজস্র প্রশ্রয় পেয়ে-পেয়ে তার মনে অসংখ্য কুঁড়ি ধরতে লাগলো। তার শিক্ষা হ'য়ে পড়লো একটু একপেশে, তার সহানুভূতি একমুখো· তার প্রকৃতিতে একটুখানি সহজ বন্যভাব যেন লেগেই রইলো।

এমনি, সে উঠতে লাগলো বড় হ'য়ে। কাজল বন্ধ হ'য়ে গেলো, তার লেখা বন্ধ হ'লো না। সে ভালোবাসতো কথা, শিশু যেমন রঙ ভালোবাসে। কথার রঙ লাগলো তার মনে : তার ভালো লাগতো রঙিন কথাগুলোকে পর-পর সাজাতে, বিশেষ একটা ছন্দে, ছবির মত করে'। তার যে আর-কোনো মানে আছে,

তখন পর্য্যন্ত তার তা মনে হ'তো না। তার ভালো লাগে, তার মজা লাগে—এ-ই হচ্ছে প্রথম এবং শেষ কথা।

তারপর কলকাতা। সে কয়েকটা পদ্য ছাপালে মাসিকপত্রে। লোকজনের সঙ্গে চেনা হ'তে আরম্ভ করলো। একটু-একটু পরিচয় হ'লো সহরের সাহিত্য-সমাজে—অন্তত তার একটা অংশে—কারণ সে-সমাজ যে কোন্‌টা আর কোন্‌টা নয়, তার মধ্যে কে যে আছে আর কে নেই, তা ঠিক করে' বলা শক্ত। তার লেখা অনেক কমে' এলো; বেশির ভাগ সময় কাটতে লাগলো গল্প করে' আর বই পড়ে'। তারপর, তার বয়েস যখন আঠারো সে হঠাৎ বা'র করে বসলো এক কাগজ—এই পল্লব। ছেলেদের, কেননা হঠাৎ সে আবিষ্কার করেছিলো যে ছেলেদের জন্য লিখে সে যত সুখ পায়, অমন আর কিছুতে নয়। কেমন করে' সে যেন নিজেকে পেয়ে গেলো। নিজেকে যেন চিনলো শিশুর জগতের অস্পষ্ট অর্দ্ধালোকে। সেখানে অদ্ভুত খেয়াল, কল্পনার উদ্দামতম মুক্তি, সেখানে অসম্ভবতম স্বপ্ন। তারই টুকরো-টুকরো ছবি সে আঁকতো—যখন খেয়াল হ'তো। যাকে খ্যাতি বলে তা তাঁর হ'লো না; কিন্তু নিজের মধ্যে একরকমের পরিপূর্ণতা সে পেলো।

সে-সব লেখা পড়ে' মিহির তাকে কল্পনা করেছিলো ক্রিস্‌টিনা রসেটির [illegible] দেখতে। সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু

সূর্য্যমুখী

সব চেয়ে যা আশ্চর্য্য তা এই যে সত্যি-সত্যি তাপসীকে সে সেইরকম দেখতে পেলো, অনেকটা ক্রিস্টিনা রসেটির মত। ঠিক এমনিই সে তাপসী দেবীকে মনে-মনে ভেবেছিলো। রজনীগন্ধার বৃন্তের মত শরীর। টানা চোখ, গায়ের রঙে ম্লান আভা, ম্লান, গ্রি-র‍্যাকেলাইট চুল। চোখের দৃষ্টি একটু যেন ক্লান্ত; ঈষৎ বেরিয়ে-আসা গালের হাড়ে থেকে-থেকে গোলাপি আভা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। তার পরনে ধবধবে সাদা সিল্ক, ইলেকট্রিক আলোর নিচে আলোর বুনোনোর মত। মিহির বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। তার যেন মনে হ'তে লাগলো এই মেয়েকে অনেক আগে থেকে সে চিনে আসছে; কবে যে তাকে প্রথম দেখেছিলো ঠিক মনে করতে পারছে না।

প্রথম পরিচয়ের পর তারা সাধারণ সভায় মিশে গেলো। ছোট একটি সাহিত্যিক দল—দু'একজনের সঙ্গে মিহিরের আগেই আলাপ ছিলো। তারা সবাই সেই সুখী সম্প্রদায়ের যাদের পয়সা আছে, প্রচুর অবসর আছে; বই পড়ে', বই নিয়ে আলোচনা করে' আর মাঝে-মাঝে দু'চার পাতা লিখে যাদের সময় কাটে। দু'জন এসেছিলেন স্ত্রী নিয়ে; মাঝে-মাঝে তাঁরা ত্রৈমাসিকের সংক্ষিপ্ত পুস্তক-পরিচয় লেখেন। লঘু, হাসিখুসি আলাপের স্রোত, মাঝে-মাঝে মোড় নেয়, কখনো ফিরে আসে, কখনো কোণাকুনি গড়িয়ে চলে—সকলেরই জন্যে, সকলের মধ্যে

সমান বিতরিত। ঘরের মধ্যে একটা উষ্ণতার অনুভব। নিজেরই অজ্ঞাতে মিহিরকে টেনে নিলে সেই উষ্ণ আবহ। সে কথা কইলো, সে হাসলো, অলক্ষিতে সে খুশি হ'য়ে উঠলো। আর সমস্ত-কিছুর আড়ালে, সমস্ত-কিছু সংযুক্ত করে', সম্পূর্ণ করে' তাপসীর শুভ্র উপস্থিতির অস্পষ্ট ঝিলিমিলি। সমস্ত কথার আর হাসির সে হচ্ছে নেপথ্য-স্থর। সাধারণ আলাপের মধ্যে মিহির সোজাস্থজি তার সঙ্গে বেশি কথা কইতে পারলে না— কিন্তু ঘরের মধ্যে এই উষ্ণ সঞ্চার যেন তার শরীর থেকেই নিঃসৃত, তাকে সে ভুলে' থাকতে পারলে না, সব সময় সে তাকে অনুভব করছে—কোনো স্থদূর, অবচেতনভাবে। আর মিহিরের যেন মনে হ'লো তাপসী তাকে টানছে—অদ্ভুত, মধুর আকর্ষণ। সে বাধা দিলে না, রোধ করলে না; সে তা উপভোগ করলে—সেই স্থদূর ঐশ্বর্য্যময় আকর্ষণ। তা ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ছে তার স্নায়ুমণ্ডলীতে সূক্ষ্ম উষ্ণস্রোতে। তা অস্পষ্ট-মধুর—অনেকক্ষণ বন্ধ ঘরে থাকবার পর রাস্তায় বেরুলে হঠাৎ গায়ে-এসে-লাগা রাত্রির হাওয়ার মত।

সাদা, কোণওয়ালা পেয়ালায় চা পরিবেষিত হ'লো। চা খেতে-খেতে একজন বললে:

'আমি ভাবছি একটা চয়নিকা বার করবো—মাসিকপত্রে প্রত্যাখাত কবিতার চয়নিকা। সঙ্গে-সঙ্গে সম্পাদকের মন্তব্য থাকবে।'

'চমৎকার।' মহিলাদের একজন বললেন, 'কবিতা যা-ই হোক্, মন্তব্যগুলোর জন্যই বইখানা পড়বার মত হবে।'

'কবিতাও কিছু খারাপ হবে না। প্রথমেই থাকবে গীতাঞ্জলি থেকে কয়েকটা গান। ধরা যাক্ "শ্রাবণ ঘন গহন মোহে"। অখ্যাতনামা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি পাঠিয়েছেন কোনো বিখ্যাত সম্পাদকের কাছে। সম্পাদক কী বলে' তা ফেরৎ দেবেন বলতে পারেন?'

শশাঙ্ক সেন, যার প্রথম উপন্যাস অল্পদিন হ'লো বেরিয়েছে, উত্তর দিলে :

'সহজেই বলা যায়। ভয়ঙ্কর বিবেকওয়ালা সম্পাদক, প্রত্যেকটি লেখা নিজে পড়েন, নিজের হাতে চিঠি লেখেন। নিজের মতামতের উপর অসীম শ্রদ্ধা। তাঁর মন্তব্য অনেকটা এই গোছের হবে : "কবিতা দুই প্রকার—ভালো ও মন্দ। আপনার কবিতা ভালো নয়, সুতরাং তা মন্দ। মন্দ কবিতা লিখিতে কোনো বাধা নাই, কিন্তু তার প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন।" এতে হবে, নৃপেশ?'

নৃপেশ—প্রথমে যে কথাটা তুলেছিলো—মুচকি হেসে বললে : 'মন্দ নয়, কিন্তু এর চেয়েও ভালো হ'তে পারে।'

'কি যদি ঠাট্টার দিকে যাও, সমাজপতি আর প্রভাত মুখুয্যের মিশেল ঢঙে, তা হ'লে এ-রকম হ'তে পারে : "আপনার বন্ধু ও প্রিয়তম কেন যে আপনাকে হেলায় ঠেলিয়া চলিয়া গেলো, এই

কবিতা পড়িয়াই তা বোঝা যায়। আপনারই মঙ্গলের জন্য এ-লেখা আমরা ছাপিলাম না; কেন সামান্য একটা লেখার মোহে সমস্ত বন্ধুদের বিসর্জ্জন দিবেন?" '

'না, এটা বড় বাড়াবাড়ি হ'য়ে যায়।'

'সম্পাদকদের কথাই যখন উঠলো,' সুভদ্রা সরকার বললেন, 'একটা সত্যি গল্প শুনুন। একটি ছেলে কতগুলো কবিতা নিয়ে যায় চিত্রাঙ্গদা অপিসে। প্রথমে সে জামার বাঁ পকেট থেকে একতাড়া তর্জ্জমা বার করলে। সম্পাদক সেগুলোর দিকে একবার তাকিয়েই বললেন: "তর্জ্জমা আমরা ছাপিনে।" "এমনি লেখাও আছে," ব'লে' ছেলেটি ডান পকেট থেকে অন্য-এক তাড়া বার ক'রে' টেবিলের উপর রাখলে। "এত বড় কবিতা চলবে না," কাগজের তাড়াটা হাতে নিয়েই সম্পাদক বললেন। "ছোট কবিতাও আছে। পিছনে দেখুন।" সম্পাদক পিছনে দেখলেন, গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। ছ' পাতাব্যাপী প্রেমের কবিতা থেকে দু'লাইনের এপিগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত রকম জিনিস ওতে আছে।'

'তা সম্পাদকেরই বা এমন জেদ কেন? মাসিকপত্রে যে-কোনো পদ্যই তো ছাপা যায়—এবং ছাপা হয়।'

'শুনুন না। তখন সম্পাদক একবার তর্জ্জমাগুলোর দিকে, একবার অন্য পদ্যগুলোর দিকে তাকাতে লাগলেন—আর ঘেমে উঠতে লাগলেন। ছেলেটি চুপ ক'রে' ব'সে' মজা দেখতে লাগলো।

খানিক পরে সম্পাদক হঠাৎ বলে' উঠলেন : "হয়েছে। আপনার এই লেখাটিই আমরা রাখতে পারি।" বলে', মূল রচনার মধ্যে সবার উপরে যে-লম্বা পদ্য ছিলো, সেটি দেখালেন।

' "অত বড় কবিতা চলবে?"

' "তা কোনোরকমে ঠেসে দিতে পারবো। লেখা ভালো হ'লেই হ'লো—এই আমার প্রিন্সিপ্‌ল্।"

' "আচ্ছা, ধন্যবাদ—"

' "পরের মাসের চিত্রাঙ্গদায় কবিতাটি বেরুলো। কবিতার উপরে ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা, "রুপার্ট ব্রুক হইতে"। ছেলেটি মাথায় হাত দিয়ে বসলো। হাঁপাতে-হাঁপাতে গেলো সম্পাদকের কাছে।

' "এ কী হয়েছে?"

' "কী হয়েছে?"

' "এই যে রুপার্ট ব্রুক?"

' "ও, ওটা আমিই বসিয়ে দিয়েছি। আপনার তো নাম নেই, আপনার লেখা এত বড় কবিতা ছাপলে ভালো দেখায় না। আপনারও এতে ভালোই হবে—আপনার কবিতা কে পড়তো, বলুন—রুপার্ট ব্রুকের নাম দেখে তবু যদি একটু পড়ে। আপনি কিছু ভাববেন না—কেউ তো আর মিলিয়ে দেখতে যাবে না।" '

সবাই হেসে উঠলো। একজন বললে, 'সম্পাদকদের সম্বন্ধে সব গল্প সংগ্রহ করে' একটা বই করলেও হয়।'

সূর্য্যমুখী

সম্পাদকদের নিয়ে আলোচনা চললো। সবারই দু'একটা গল্প জানা আছে বলবার মত। এই হচ্ছে সাহিত্যের অলিগলি—নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়াবার এমন জায়গা আর নাই। জীবনের সমস্ত কমেডি সেখানে ছড়ানো। সুকুমার রায়ের জগতের মত তা বিকৃত, অতিরঞ্জিত, আজগুবি, হাস্যকর, অসম্ভব।

রাত বাড়লো। কেউ একজন উল্লেখ করলে ওঠবার কথা। তাপসী বললে, 'বোসো, এখনই কী?' সবাই যেন একটু নড়ে-চড়ে' ভালো হ'য়ে বসলো। আলাপ চলতে লাগলো ক্ষীণস্রোতে, থেমে-থেমে। হঠাৎ শশাঙ্ক সেন, মিহিরের দিকে তাকিয়ে: 'মিহির, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এলেই পারতে?'

মুহূর্ত্তে মিহির গলা পর্য্যন্ত আরক্ত হ'য়ে উঠলো। এবং সে অনুভব করলে যে সবাই তা লক্ষ্য করেছে। সে কোন্‌দিকে তাকাবে বুঝতে পারলে না।

তাপসী তাকে বাঁচিয়ে দিলে:

'আমারই দোষ। আমি জানতুম না ...'

শশাঙ্ক বললে: 'অনেকেই জানে না। মিহিরের স্ত্রীকে কেউ কখনো দ্যাখেনি।'

মিহির চেষ্টা করে' বললে: 'তাকে এখানে আসতে বললেও সে আসতে চাইতো না'

'কেন, তিনি কি তোমাকে দিয়ে আমাদের সবাইকে বিচার করছেন নাকি?'

সবাই হাসলো, মিহির সব চেয়ে বেশি। হাসতে পেয়ে সে বাঁচলো। এই সুযোগে তাপসী প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তন করলে :

'আপনি অনেকদিন কিছু লিখছেন না, মিহিরবাবু।'

সুভদ্রা সরকার বলে' উঠলেন, 'কেবল একজনের জন্যেই লিখছেন?'

'সব সময়েই তো আমি একজনের জন্যই লিখি।'

সুভদ্রার চোখে কৌতূহলের ছটা।—'সব সময়?'

'সব সময়। একজনের জন্যেই আমার সব লেখা। সে আমি নিজে।'

সুভদ্রার মুখে একটু নিরাশার ছায়া পড়লো। আর তাপসী জিজ্ঞেস করলে, বাঁ দিকে চওড়া সিঁথি-করা তার মাথা ঈষৎ মিহিরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে :

'তা হ'লে অন্য লোকের জন্য আপনি মোটেও ভাবেন না? তারা পড়লো কি না পড়লো, তাদের ভালো লাগলো কি লাগলো না?'

'অতটা বলতে পারিনে। অন্যকে পড়াতে তো চাই-ই; কে না চায়?'

'তবে?'

'সেই তো মুস্কিল। আর সেই তো দুঃখ। আমার মনে আছে একটা কথা, তা আমি বলতে চাই। অন্যদের বোঝাতে চাই। কিন্তু আমার কাছে সে-কথার যা মানে, তা শুধু আমারই কাছে। অন্যরা তা বোঝে না, বুঝতে পারে না। প্রত্যেকের মনের আলাদা ছাঁচ, তারই সঙ্গে আমার লেখা তারা মানিয়ে-মানিয়ে নেয়। তারা যা পড়ে, তা আমার লেখা নয়; আমার লেখাকে তারা যে-ভাবে পেতে চায়, পেতে পারে—মানে, আমার কবিতার তাদের নিজস্ব পাঠ। অনেক রকম মানুষ, তাই সে-পাঠ অনেক রকম হ'তে বাধ্য। তার মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায়—ঠিক আমি যে-কথা বলতে চেয়েছিলুম। আমার কবিতায় অমি যা পড়ি, অন্য-কেউ তা পড়ে না, পড়তে পারে না। কেবল আমারই জন্য আমার লেখা।'

'চিরন্তন আক্ষেপ! এ-কথা মেনে নিলে তো লেখাই ছেড়ে দিতে হয়।'

'মাঝে-মাঝে আমার তো ইচ্ছাই করে ছেড়ে দিতে। মানুষ এত আস্তে-আস্তে বাড়ে আর আয়ু এত কম আর মানুষের ভাষা এত দুর্ব্বল যে লেখবার কোনো মানে হয় না।'

মিহির আর তাপসী দল থেকে একটু পাশে সরে' এসেছিলো; তাদের কথা আর-কেউ শুনছিলো না। ছোট-ছোট দলে ভেঙে গিয়ে বিক্ষিপ্ত, মৃদু আলাপ—কোনো সভার শেষের দিকে যেমন হয়।

এরা দু'জন হঠাৎ নিজেদের দেখতে পেলো মুখোমুখি, কথায় আবদ্ধ।

'আপনার কথা হয়-তো বুঝতে পারছি। যে-সব আশ্চর্য্য কবিতা জীবনে কখনো লেখা হবে না, তার কথা ভেবে কোন্ কবির না মন-খারাপ হয়েছে? হঠাৎ মনের মধ্যে সুর এসে লাগে—রঙিন, পলাতক একটা মুহূর্ত্ত—সব সময় তাকে কথায় ধরে' রাখা যায় না। অনেক সময় তাকে ধরে' রাখতে গিয়ে দেখা যায়, এরই মধ্যে রঙ এসেছে ফিকে হ'য়ে। কত যে কথা আমরা ভাবি—যদি বা সব ধরে' রাখা সম্ভব হ'তো, সময় নেই। সময় নেই; দিনগুলো বড় ছোট, জীবনে নানারকম জিনিসের ভিড়। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় কবিকেও যা হারাতে হয়, সে-তুলনায় তিনি যা দিয়ে যান তা অত্যন্ত তুচ্ছ। আর মানুষের পরিণতি এত মন্থর, কোনো অনুভূতি আসতে-আসতেই হয়-তো জীবনের অর্দ্ধেক কেটে গেলো। যে-বয়েসে আমরা ভাবতে শিখি, যে-বয়েসে জীবনের ঘটনাগুলোকে মনের মধ্যে কিছু-একটা করে' তোলবার ক্ষমতা আমাদের হয়, তা এত দেরিতে যে ভাবতে গেলে মন খারাপ হ'য়ে যায়। প্রতি বছরেই যেন আমার নতুন কোনো সত্তা, প্রতি বছরই মনে হয়, "এতদিন আমি কোথায় ছিলুম?" কী যেন একটা মনের মধ্যে ক্রমাগতই ভেঙে যাচ্ছে, হ'য়ে উঠছে। দিগন্ত কেবলই যাচ্ছে দূরে সরে'। নিজেকে দেখে-দেখে অবাক লাগে, হতাশ হ'তে হয়।

যেটুকু আমার প্রকাশের ক্ষমতা, তাকে আমি কেবলই ছাড়িয়ে যাবো। মনে হয়, নিজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে কখনো পারবো না। মনের মধ্যে যে-সব সূক্ষ্ম ছায়া ক্ষণিক রেখা এঁকে যাচ্ছে, কোথায় পাবো তার ভাষা ? তখনই মনে হয়, কী হবে বলে' ? ভাষা তো একটা বাধা : তা নষ্ট করে, বিকৃত করে, তার ভিতর দিয়ে ভাবনা ছড়িয়ে যায়, যায় হারিয়ে। ভাষার সীমা আছে, ভাবনার নেই। ভাবনার কোনো বাধা নেই : তা সর্ব্বব্যাপী ও চিরন্তন। তা সহজ, বিশুদ্ধ, সীমাহীন। তার উপর, তাতে শারীরিক কোনো চেষ্টার দরকার করে না। ভাবতে এত ভালো লাগে যে—যে বসে'-বসে' কেবল ভাবতেই ইচ্ছে করে। মনের ভিতরটা এমন নিবিড়, এমন সোনালি হ'য়ে ওঠে যে তখন আর কলম ছুঁতে ইচ্ছে করে না। তখনই লেখা ব্যাপরেটাকে মনে হয় অসহনীয় স্থূল। মনে হ'তেই পারে। কিন্তু তাই বলে", হঠাৎ একটু থেমে তাপসী কথাটাকে ব্যক্তিগত স্তরে নামিয়ে আনলো, 'একেবারে না-লেখবার কোনো মানে হয় না', সে হেসে বললে। অনেকদিন কোনো কাগজে আপনার কোনো লেখা দেখিনি।'

'কাগজে দিইনে অনেকদিন।'

'লিখেছেন, তা হ'লে ?'

মিহির একটু হাসলো।—'মাসিকপত্রে কবিতা ছাপবার কথা ভাবতে মাঝে-মাঝে আমার অসহ্য বিতৃষ্ণা হয়। আমি যা লিখেছি

তার উপর কেউ ট্র্যামে যেতে-যেতে অলসভাবে একটু চোখ বুলিয়ে গেলো—এ আমি সইতে পারিনে। কি, কোনো ডিপ্‌টি-গিন্নির দিবা-নিদ্রার সহায়তা করতে—'

তাপসীর মৃদুস্বর তাকে বাধা দিলে। 'কিন্তু সবাই ও-রকম নয়', সে বললে।

'প্রায় সবাই।'

'কিন্তু সবাই নয়। অন্য যে দু'চারজন, তাদের নিয়েই তো কথা। আর্ট জিনিসটাই সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক।'

'এ-কথা ভাবতে খুবই আরাম লাগে—যতক্ষণ ধরে' নেয়া যায় যে আপনি আর আমি দীক্ষিতের দলে।'

'তা কি নই?'

বাঁকা ভুরুর নিচে তাপসীর টানা চোখের দিকে তাকিয়ে মিহির চুপ করে' রইলো। 'সব সময়েই দু'চারজন থাকে, তাপসী বলতে লাগলো, 'এ-ই তো সান্ত্বনা। কোনোখানে, কেউ হয়-তো আপনার মত করে' ভাবছে। আপনার কথা যেই তার মনকে ছুঁয়ে গেলো, জেগে উঠলো প্রতিধ্বনি—যেন সে-কথা তারই মধ্যে এতদিন ছিলো চাপা হ'য়ে। হয়-তো সেই দু'চারজনের জীবনে আপনি কয়েকটি সোনালি মুহূর্ত্ত এনে দিলেন—সেটাই কি কম? সেখানেই সার্থক হ'লো আপনার লেখা। তারপর—তা না-ই বা থাকলো, না-ই বা মনে রাখলে লোকে। এমন

ঐশ্বর্য্য পেয়ে ও দিতে পেরেও যে আরো বেশির লোভ করে, তাকে কী বলবো?'

তাপসীর কথা বলার ধরণে প্রবল আগ্রহ, আনন্দের ছন্দ। নদীর মত তা তার ভিতর থেকে প্রবাহিত। ছোট-ছোট ঢেউ তুলে যাচ্ছে চারদিকে। মিহির সেই উদ্দীপিত উষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে লাগলো, মুগ্ধ। এক-এক সময় তাপসী একটু তাড়াতাড়ি কথা বলে, একটু উচ্চস্বরে, নিজেই তা টের পায় না। আর সে যখন হাসে, হঠাৎ তার সমস্ত মুখ যেন আলোয় জ্বলে' ওঠে।

মিহির আর-কিছু বললে না। কিছু বলবার ছিলো না বলে' নয়, অনেক-কিছু বলবার ছিলো বলে'। অদ্ভুতরকম চঞ্চল হ'য়ে উঠছিলো তার মন। তার ইচ্ছে করছিলো কথা বলতে, চুপ করে' থাকতে, তাপসীর শুভ্র সাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে।

একজন উঠে দাঁড়ালো। ভাঙলো সভা। সবাই উঠছে, সবাই একসঙ্গে কথা বলছে। মিহিরকেও উঠতে হ'লো। পুরো দলটি একসঙ্গে বেরুলো, বারান্দা পার হ'য়ে রাস্তায়। কে যেন কী একটা-কিছু বললে, একটা হাসির ঢেউ খেলে' গেলো। গর্জ্জে' উঠলো একটা মোটরের এঞ্জিন।

—'তাপসী, ভুলো না কিন্তু।'

—'নৃপেশ আমাদের গাড়িতে এসো না।'

—'চলো হাঁটি। চমৎকার রাত।'

সূর্য্যমুখী

—'কারো কাছে একটা সিগ্রেট আছে?'

—'...পড়ে' দেখো। সত্যিকারের ভালো লেখা।'

—'আঃ, আমার ঘুম পেয়ে আসছে।'

কণ্ঠস্বরগুলো দূরে সরতে লাগলো, ক্ষীণ হ'য়ে এলো, মিলিয়ে গেলো। আর হঠাৎ মিহির নিজেকে দেখতে পেলো, রাত্রির রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তাপসীর মুখোমুখি। তাপসী ক্ষীণ একটা ভঙ্গি করলে। সবাই চলে' গেছে, অথচ সে এখনো দাঁড়িয়ে কেন? মিহির ভেবে অবাক হ'লো। সে কি কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিলো? সে কি আরো কোনো কথা শুনতে চায়? তার যেন মনে হচ্ছে তাপসীর সঙ্গে অনেক কথাই তার বাকি রয়ে' গেলো। দু'জনের মধ্যে একটা সংস্পর্শের সূত্রপাত যে-মুহূর্ত্তে হ'লো, অমনি তা গেলো ছিন্ন হ'য়ে।

তাপসীকে সে বলতে শুনলো: 'আপনার দেরি হ'য়ে গেলো না তো?'

আর সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে ফিরে এলো তার বাড়ি; অভুক্ত, অপেক্ষমান, মৃণাল; সমস্ত রাত্রি ভরে' মৃণালের নিঃশব্দ সঞ্চার; রাত্রি ভরে' মৃণালের উষ্ণ স্রোত। আর তাপসীর অস্পষ্ট শুভ্র মূর্ত্তির দিকে সে তাকালো—চাঁদের মত ম্লান, রাস্তার আবছায়ার এক টুকরো চাঁদের মত তার ঝিলিমিলি। আর হঠাৎ তার বুকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো অস্পষ্ট, উত্তপ্ত একটা ঢেউ। সে তার ঠোঁট কামড়ে ধরলো, একবার আঙুল চালিয়ে গেলো চুলের

ভিতর দিকে ; চলে' যাবার আগে কী বলা যায়, খুঁজতে লাগলো। কিন্তু এবারেও তাপসীই বললে :

'না কি ভিতরে এসে আর-একটু বসবেন ? দু'জন না হ'লে সত্যি কোনো কথা বলা যায় না।'

মিহির বললে, 'না, যাই এবার।'

'আর-একদিন আসবেন ?'

সেই অর্দ্ধ-আলোয় মিহিরের দৃষ্টি তাপসীর চোখ অন্বেষণ করে' ফিরলো। মিললো তাদের দৃষ্টি, মুহূর্ত্তকাল তারা রইলো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। দৃষ্টির ঘর্ষণে জলে' উঠলো ছোট একটা শিখা ; সেই আলোয় পরস্পরকে তারা দেখে নিলে। তারপর মিহির বললে :

'হ্যাঁ, আসবো।'

কিন্তু তাদের আবার দেখা হবার আগে পনেরো দিন কেটে গেলো। কী যেন, যাওয়া তার হ'য়ে উঠলো না। তেমন-কোনো তাগিদ অনুভব করলে না মনের মধ্যে একদিন যে দেখা হয়েছে তারই রেশ চলেছে তার মনে। তা থেকে সমস্তটা রস সে নিঙড়ে নিতে চায়। এমনি হয়—যারা বেশি ভাবে, তাদের। তাদের প্রেম মন্থর। একটু আগুনের কণা থেকে সমস্ত মনের রঙিন হ'য়ে ওঠবার সময় তারা দেয়। জীবনের অন্তরালে বেজে চলেছে কোনো সূক্ষ্ম সুর—না-ই বা বাইরে কোনো প্রকাশ থাকলো।

মাঝে-মাঝে কোনো কাজের মধ্যে, কোনো অলস মুহূর্ত্তে মিহিরের তাপসীকে মনে পড়তো—যেমন হঠাৎ আমরা চাঁদের কথা ভাবি। আর তার মন ভরে' যেতো অদ্ভুত শান্তিতে। ভাবতে ভালো লাগতো। ভাবতেই যখন এত ভালো লাগছে কী হবে গিয়ে ?

এতে করে' একটা বিপদ এই যে অনেক সময় হয়-তো যা হ'তে পারতো, তা হয় না। শেষ পর্য্যন্ত ফসকে যায়, নিবে যায়। পার হ'য়ে যায় সময়—ভাবনা নিয়েই যার জীবন, সে থাকে নিশ্চেষ্ট বসে'। সে-আশঙ্কা ছিলো মিহিরের বেলায়। এখানে যদি শেষ হ'তো, মিহির সেটাই মেনে নিতো স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য বলে। কিন্তু এক বিকেলে হঠাৎ তাপসীর সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে গেলো মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে। সে লেখবার প্যাড কিনছিলো—পিছন থেকে অত্যন্ত মৃদুস্বরে কে বলে' উঠলো :

'এই যে !'

ফিরে তাকিয়ে সে দেখলো, তাপসী।—'বাঃ, আপনি !'

'ভাগ্যিস আগে একদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো—নয় তো আপনাকে তো চিনতেই পারতুম না। পাশ কাটিয়ে চলে' যেতুম।'

'কতদিন হয়তো গেছেনও।'

'হয়-তো গেছিও!' তাপসী প্রতিধ্বনি করলে। 'হয়-তো

একই ট্র্যামে আপনার সঙ্গে অনেকটা রাস্তা গেছি। ভাবতে পারেন!'

মিহির দোকানির হাত থেকে তার প্যাকেট নিলে। একটু হেসে বললে, 'কত সময় যে আমাদের জীবনের নষ্ট হয়েছে তা আমরা জানতে পারিনে বলে'ই রক্ষে। নয় তো বাঁচতে পারতুম না।'

'আর-একটু সময় নষ্ট করবেন?'

'চলুন।' দু'জনে একসঙ্গে যেতে লাগলো।—'কোন্‌দিকে?'

'কোথায় গেলে কার্পেটের আসন পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

'না তো।'

'জানেন না?'

'দেখা যাক খুঁজে।'

মার্কেটের ঠাণ্ডা, আধো-অন্ধকার অলি-গলি দিয়ে তারা ঘুরতে লাগলো। মিহির বললে, 'এই জিনিসপত্র কেনা আর-এক হাঙ্গাম।'

'কেন, আমার তো বেশ ভালোই লাগে। বোধ হয় পয়সা খরচ করতে পেরে আমার ভ্যানিটি খানিকটা খুসি হয়।'

'যদি সেটা বাজে খরচ হয়। নেহাৎই দরকারি জিনিসের জন্য খরচ করতে হ'লে আমাদের কেমন যেন রাগ হয়।'

'তা তো হবেই। আমাদের বেঁচে যে থাকতে হবে, এ তো

জানা কথা। সেটা আমরা একরকম ধরে'ই নিই। সে-জন্য যে-খরচটা করতে হয়, সেটা, তাই, বড় বেশি গায়ে লাগে। মনে হয়,পয়সাটা একেবারে জলে গেলো। বদলে কিছুই পেলুম না। যে-খরচ আমাদের না-করলেই নয়, তাতে কোনো মজা নেই।'

'মুদি দোকান অত খারাপ লাগে তো সেই জন্যেই। মুদি লোকটি যে পৃথিবীতে আত্মাহীনতার একটা প্রচলিত দৃষ্টান্ত তা তার নিজের দোষে নয়, তার পণ্যের দোষে। সংসারে বাড়িওয়ালা নামক জীব বোধ হয় সব চেয়ে বেশি বিদ্বেষের পাত্র। অথচ—তার কী দোষ? এদিকে এসেন্সের দোকানে গিয়ে অত্যন্ত বেশি খরচ করতে শুধু যে আমাদের খারাপ লাগে না, তা নয়, খরচ করতে পেয়ে আমরা খুসি হই। সেখানে, এমন কি,দোকানির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করি। সে-লোকটিকে আমাদের ভালো লাগে, যদিও মুদি কি বাড়িওয়ালার সঙ্গে তার মূলগত কোনো পার্থক্য নেই।'

পাওয়া গেলো দোকান। তাপসী তার জিনিস কিনলে। মিহির সেটা হাতে তুলে নিয়ে বললে: 'এখন বাড়ি যাবেন তো?'

'আপনি?'

'আমি বাড়ি যাবো। চলুন আপনাকে ট্র্যাম পর্য্যন্ত পৌছিয়ে দিয়ে আসি।'

'আপনিও চলুন না আমাদের ওখানে।'

'এখন ?'

'দোষ কী ?'

'এখন কী ক'রে' হয় ?'

'কিছুতেই হয় না ?'

মিহির দুপুরবেলায় সহরে গিয়েছিলো কাজে, এই ফিরছে। নিজেকে তার অপরিচ্ছন্ন, ধূলিময় মনে হচ্ছিলো। ঠিক এইভাবে তাপসীর সঙ্গে চ'লে যেতে খুঁতখুঁত করছিলো তার মন। তাই সে বললে :

'বাড়ি হ'য়ে যেতে পারি—যদি বলেন।'

'আমি তো অনেক আগেই বলেছিলুম।'

মিহির ক্ষীণ হেসে বললে, 'না, আজকে ঠিক যাবো।'

দু'জনে মার্কেট থেকে বেরুলো। তাপসীর ট্র্যাম ধর্ম্মতলায় —বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে। তাপসী মিহিরের নিযুক্ত হাতের দিকে তাকিয়ে বললে: 'আমাকে না-হয় একটা দিন্—যদি অসুবিধে হয়।'

'না-হয় অসুবিধে হ'লোই একটু।'

একটু সময় তারা চুপচাপ হাঁটলো। এম্পায়ার থিয়েটারের দেয়ালে সিনেমার জ্বলন্ত পোস্টর: এক অর্দ্ধ-নগ্ন, অর্দ্ধ-শায়িত স্ত্রী-মূর্ত্তি এক পা উপর দিকে তুলে দিয়ে হাসছে—সে-হাসিতে সম্পূর্ণতম, বিশুদ্ধতম নির্ব্বুদ্ধিতা।

'তবু আমরা গর্ব্ব করে বলি', মিহির বললে, 'যে এটা হচ্ছে পৃথিবীর সভ্যতম যুগ।'

'কিন্তু সাধারণ লোকের জন্য কী ব্যবস্থা করবেন? সবাই তো আর তারার গতিবিধি লক্ষ্য করে' কি রবীন্দ্রনাথ পড়ে' অবসর কাটাতে পারে না।'

'যা-ই বলুন না, রোজ এত লোক এই-সব জিনিস দেখছে, এবং দেখে উল্লসিত হচ্ছে, তা ভাবলে আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।'

'একমাত্র সান্ত্বনা এই যে না-দেখেও পারা যায়। যার যেমন খুসি তেমনি জীবন কাটাতে পারে।'

'সবাই পারে?'

'কেউ-কেউ তো পারে। যারা পারে না, তাদের নিজেদের কোনো জীবন নেই। তারা প্রত্যেকে বিরাট গণ-মনের এক-একটা স্পন্দন।'

'তা হ'লে তো সব ভাবনাই ঘুচলো।'

'আপনার নিজের যাতে কোনো ভাবনা না থাকে, আজকালকার সভ্যতার সেটাই তো উদ্দেশ্য। তারা সব ভেবে রেখেছে আপনার হ'য়ে। আপনি কী করবেন। কী পড়বেন, কেমন করে সন্ধ্যা কাটাবেন। ছুটিতে কোথায় যাবেন। এটা কি কম আরাম! আর আপনার হৃদয়ে কী প্রবল গণ-উচ্ছ্বাস এসে লাগে, যখন আপনি দেখেন অন্য সবাই তা-ই করছে, তা-ই

পড়ছে, সেখানেই যাচ্ছে। অসংখ্যের একজন হবার মহৎ আনন্দ প্রতি মুহূর্ত্তে পাচ্ছেন আপনি।'

মিহির বললে, নিঃশ্বাস ছেড়ে, 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে।'

'অবিশ্যি হতাশ হবার কিছু নেই। পৃথিবীর যা-ই হোক, আমার কিছু এসে যায় না। আমি তো আছি নিজের মনে।'

'তা কি পারেন—সব সময়? পৃথিবী আপনাকে কখনোই একবারে একা থাকতে দেবে না।'

'তবু—যদি বুঝতে পারি, যদি ছটফট করতে পারি, তা হ'লেই মনে করবো বেঁচে গেলুম।'

তারা ধর্ম্মতলায় এসে পড়লো। রাস্তা পার হ'য়ে তাপসী বললে: 'ক্লান্ত লাগছে। সম্প্রতি এই বিষাক্ত সভ্যতার অন্যতম সৃষ্টি ট্র্যামগাড়ির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

সেই সন্ধ্যা মিহির কাটালো তাপসীর সঙ্গে। সে তাকে পেলো ছোট ঘরে, সামান্য তার আসবাব। সেখানে বসে' সে পল্লবের কাজকর্ম্ম করে। নিচু একটা ক্যানভাসের ইজি-চেয়ারে বসে' সে একটা চিঠি পড়ছিলো। তার পরনে সাদা তাঁতের সাড়ি, লাল মখমলের চটিতে ঢোকানো তার পা। মিহিরকে দরজার কাছে দেখে চিঠিটা খামে ভরে' রেখে সে উঠে দাঁড়ালো।

—'যাক্, আপনি সত্যি-সত্যিই তা হ'লে এলেন।'

'আপনার কাজে বাধা দিলুম?'

'মোটেও না। এখানেই বসবেন—না, পাশের ঘরে যাবেন?'

'এখানেই তো ভালো। ছোট ঘরই আমার ভালো লাগে।'

ঘরে যে আর একটিমাত্র চেয়ার ছিলো, মিহির তাতে বসলো। তাপসী জিজ্ঞেস করলে:

'এতদিন কী করলেন?'

'কী করলুম? কই, কিছুই তো মনে পড়ছে না।'

'সেটা এমন-কিছু খারাপ নয়, ভেবে দেখতে গেলে।'

'না। জীবনের নিবিড়তম সুখের মুহূর্ত্ত, বরং। অনেকে বলবে আলস্য—কিন্তু সে-আলস্য শুধু শরীরের।'

'জানি। মনটা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত আকাশ ভ'রে': নিজেরই ভিতর থেকে উৎসারিত কোনো স্রোত।'

'মাঝে-মাঝে এমন হয় যে যেদিকে তাকাই সেখানেই মনে হয় কী রহস্য। নতুন কোনো দৃষ্টিতে জীবনকে দেখবার মত। একটা লাইন পড়লে পাঁচ মিনিট চুপ ক'রে' থাকতে ইচ্ছে করে। এক সঙ্গে এত কথা মনে আসে যে কোনোটাই লেখা হয় না। এক কথায়, কাজ যাকে বলে, তা হয় না কিছুই।'

'কেন যে মানুষকে কাজ করতেই হবে!'

'কেন যে সবাইকে কাজ করতে হয় তা তো জানেন।'

'সে-কথা নয়। যদি নিছক জীবিকার জন্য কাজ হয়, তাতে

বোধ হয় বিশেষ-কিছু এসে যায় না। সেটা নেহাৎই যান্ত্রিক, মন সেখানে থাকে নিঃসাড় হ'য়ে।'

'না কি—মনকে তা নিঃসাড় করে' তোলে?'

'জানিনে,' তাপসী হেসে বললে, 'অভিজ্ঞতা নেই।'

'ছেলেবেলা থেকে আমাদের শেখানো হয়েছে কাজের মাহাত্ম্য। কোন্ বালক তার জন্মদিনে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের আত্মজীবনী উপহার না পেয়েছে? এত বলবার দরকার হয় কেন? মানুষের স্বভাবে নিশ্চয়ই কাজের প্রতি সহজ একটা বিমুখতা আছে।'

'যদি না সে-কাজে আনন্দ থাকে।'

'যদি না সে-কাজে আনন্দ থাকে,' মিহির বললে, 'যদি না সে-কাজ খানিকটা খেলা হয়। কিন্তু আজকালকার সব কাজই এমন ছাঁচে-ঢালা, ব্যক্তিকে তা কোনোখানে স্পর্শ করে না। কিন্তু মানুষকে কোনো একটা অবলম্বন দিতে হয়—কোনোভাবে তাকে জানানো চাই যে সে সার্থক। সেইজন্য বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের দরকার। কাজের জন্যই কাজ।'

'আরো আছে। টাকার জন্য কাজ। যে-আনন্দ মানুষ কাজের ভিতর দিয়েই পেতে চায়, তার বদলি হিসেবে তাকে দেয়া লোভের উত্তেজনা। কেবল পয়সা করারই পরম মাহাত্ম্য, তাতে বিশ্বাস না-করলে কি আপনি মনে করেন এত লোক দিনের পর দিন এমন অনাপত্তিতে অবিশ্রান্ত কাজ করে' যেতে পারতো.

সূর্য্যমুখী

'কোনোখানে একটা বিশ্বাস থাকতে বাধ্য। যার যে-ধর্ম্ম, তার সমর্থন না পেলে মানুষ কিছু করতে পারে না। সমগ্র জাতির একটা সম্মিলিত ধর্ম্ম থাকে। এক-এক যুগে তা এক-এক রকম।'

একটু ছেদ। মিহির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাপসীর দিকে তাকালো। ঝক্‌ঝক্ করছে তার চোখ, তার লাল পাৎলা ঠোঁটের প্রান্ত ক্ষীণতম হাসিতে বাঁকানো। একটা চাবুকের মত, তার শরীর। তার সাদা সাড়ির উপর খয়েরি বুটি তোলা, যেন ছোট-ছোট কৌতূহলী চোখ ফুটে রয়েছে। একটু সময় মিহির তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলে না। তারপর সে বললে, নিজের কথার জের টেনে:

'সব সময় আমাদের আজকাল ভয়, পাছে সময় নষ্ট হয়। সময় নষ্ট না-করবার এই মর্ম্মান্তিক চেষ্টায় জীবনকে আমরা নষ্ট করে' ফেলেছি।'

'যদিও আমরা তা জানিনে। আর সেটাই সব চেয়ে খারাপ। জীবনকে আমরা ইঁটের দেয়ালের মত নিরেট করে' তুলি, আর মনে-মনে বলি, খুব কষে' খানিকটা বাঁচা গেলো। চলতি ভাষায় যাদের বলে কৃতীপুরুষ, তাদের যে-কোনো একজনের জীবনের কাহিনী যে-সুরে লেখা হয় তাইতেই বোঝা যায়।'

'আপনি যদি না-ই জানতে পারেন, তা হ'লে, আর যা-ই হোক,

আপনাকে অসুখী হ'তে হয় না। বিপদ তাদেরই যারা এখনো সময়-ধর্ম্মের প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হ'য়ে যায়নি। যারা এখনো বাঁচতে চায়; মানুষের একা থাকবার পবিত্র অধিকারকে যারা ছাড়তে চায় না।'

'তারা অসুখী হবে, তারা দুঃখ পাবে। কিন্তু তাদের কোনো ভয় নেই। হয়-তো তাদের পক্ষে সুখী হবার প্রয়োজন নেই। হয়-তো অন্য-কোনো রকম সুখ তারা পেয়েছে, যাতে সমস্ত পুষিয়ে যায়।'

'তা-ই আশা করা যাক্।'

'কিন্তু তা-ই যে।'

'ঠিক জানেন?'

'আপনি কি জানেন না?'

তাপসীর উজ্জ্বল, টানা চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি মিহিরের মুখের উপর এসে পড়লো। সে-দৃষ্টি যেন বড় বেশি দেখছে, মিহির চোখ নামিয়ে নিলে। প্রশ্নটা এড়িয়ে নিয়ে সে বললে:

'আমি ভেবে দেখেছি আমাদের একমাত্র মুক্তি হচ্ছে আলস্যে।'

'কিন্তু সে-মুক্তি সহজ নয়। সত্যি বলতে, কিছু-না-করে' থাকার মত কঠিন আর-কিছু নয়। মানুষ নিজের নিঃসঙ্গতাকে ভয় করে। আর-কিছুর জন্য না হ'লেও, নিজের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মানুষকে কাজ করতে হ'তো।'

'না, সহজ তো নয়ই,' মিহির একটু চুপ করে' থেকে বললে, 'মানুষের সব চেয়ে কঠিন সাধনা হচ্ছে আলস্য। আমরা যদি মাঝে-মাঝে অলস হ'তে পারতুম, তা হ'লে বেঁচে যেতুম। শান্ত, সোনালিরকম অলস। যদি মাঝে-মাঝে ভুলতে পারতুম আমাদের এই প্রাণ-ঘাতী চেষ্টা! সুখী হবার চেষ্টায়, বুদ্ধিমান হবার চেষ্টায়, ভালোবাসবার চেষ্টায় আমরা মরে' যাচ্ছি!' তারপর, তাপসীকে নীরব দেখে:

'আমাদের লেখাতেও সেই চেষ্টা। আমরা যেন এক মুহূর্ত্ত ভুলে' থাকতে পারিনে যে আমাদের ভালো লিখতে হবে। আত্মপ্রকাশ করবার নিষ্ঠুর চেষ্টায় আমরা আত্মহত্যা করি। সব সময় কি আত্মপ্রকাশ করতে হবে? কিছু ফেলে-ছড়িয়ে দিতে হয়, প্রকৃতিতে অজস্র অপব্যয়। যেখানে অপব্যয় নেই, সেখানে লাবণ্য নেই। আর এই অপব্যয়কেই আজকাল আমরা সব চেয়ে ভয় করি। সময়ের অপব্যয়কে ভয় করি, চিন্তার অপব্যয়কে ভয় করি। আমাদের চিন্তার প্রত্যেকটি ছেঁড়া সুতোকে আমরা লেখার মধ্যে গুঁজে দিতে চাই, জমিয়ে রাখি সেগুলো মনের মধ্যে। হারাতে পারিনে। সব সময় আমরা আত্ম-সচেতন, সতর্ক। জীবন থেকে সব সময় কিছু-না-কিছু টেনে বার করতে আমরা প্রস্তুত। আমাদের ফাঁকি দেবার উপায় নেই। কখনো আমরা নিজেকে একটু ছেড়ে দিইনে, মিশে যাইনে আশে-পাশের

আবহাওয়ায়, কখনো ভরে' উঠিনে নিশ্চিন্ত শান্তিতে। কখনো জোর করে' বলতে পারিনে—বয়ে' গেলো! সব সময় আমরা ভাবি, ভাবি, ভাবি: যে-কোনো জিনিস নিয়ে ভাবি, নিজেকে নিয়ে সব চেয়ে বেশি ভাবি।'

এমনি তারা কথা বললে, শীতের সন্ধ্যা ভরে' ছোট সেই ঘরের নিবিড় আবহাওয়ায়। বাইরে, রাস্তায় ধোঁয়া জমে' উঠলো, ধোঁয়া কেটে গেলো, কালো আকাশে ঝক্‌ঝক্ করে' উঠলো তারা, পূবের আকাশে দেখা দিলো কালপুরুষ। আর তারই কোণ ঘেঁষে কখন উঠে এলো কৃষ্ণপক্ষের কোণ-ভাঙা ম্লান চাঁদ। তারা দু'জন যখন একসঙ্গে বেরিয়ে এলো বারান্দায়, হঠাৎ সেই চাঁদ পড়লো তাদের চোখে। দু'জনে একসঙ্গে থমকে দাঁড়ালো, স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। আর একটু পরে:

'চাঁদ!' রুদ্ধস্বরে তাপসী বলে' উঠলো।

'আপনার কি মনে হয় চাঁদ জানে?' মিহির জিজ্ঞেস করলে।

'কী জানে?'

'এই—এতক্ষণ আমরা যা-কিছু বলছিলুম। চাঁদ কি মনে-মনে হাসে?'

তাপসী কিছু বললে না। তারা আরো কয়েক পা এগিয়ে এলো সিঁড়ির দিকে। মিহির আবার বললে, 'কেন আমরা এত কথা বলি, আকাশে যখন চাঁদ রয়েছে?'

বাইরের ঠাণ্ডায় তাপসী হঠাৎ একটু কেঁপে উঠলো। খুব আস্তে-আস্তে সে বললে, 'চাঁদ জানে।'

'হ্যাঁ—চাঁদ তো সেই কথাই বলে যা আমরা সবাই বলতে চাই, কিছুতেই বলতে পারিনে।' বলে' মিহির সিঁড়িতে নেমে এলো। তারপর একবার মুখ ফিরিয়ে তাপসীর দিকে তাকালো—আর হঠাৎ তাপসীর ঈষৎ-ক্লান্ত চোখের উপর থেকে কী যেন একটা আবরণ সরে' গেলো, উজ্জ্বল, উত্তপ্ত স্রোতে নেমে এলো তার দৃষ্টি, অন্ধকার বন্যার মত, তারাময় ঘূর্ণির মত। আর কোনো কথা হ'লো না।

রাস্তায় বেরিয়ে মিহির আবার শীতের শ্বেত চাঁদের দিকে তাকালো। আর তার মনে ভরে' গেলো এক আশ্চর্য্য শান্তিতে। চাঁদ তাকে স্পর্শ করেছে, চাঁদ তার বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে' বলছে, 'ভয় নেই।' হঠাৎ তার বুকের মধ্যে নতুন এক শান্তির চেতনা। সে দ্রুতপদে কয়েক পা হাঁটলো, তারপর তার মনে পড়লো মৃণালের কথা। আশ্চর্য্য—মৃণালের কথা আজ সে কী সহজে ভাবতে পারছে। সে আর তাকে ভয় করে না—তার বুকের মধ্যে আজ চাঁদের আশ্চর্য্য শান্তি। আ—এইবার সে জয়ী হবে মৃণালের উপর। এতদিনে তার মুক্তি। কী দীর্ঘ, দীর্ঘ যন্ত্রণা সে পেয়েছে—রাত্রির সেই শৃঙ্খল, অন্ধকারের পাষাণ-নিষ্পেষণ। নিজের মধ্যে সে দীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু সে

চাঁদকে ভুলে' ছিলো। সে জানতো না নেপথ্যে অপেক্ষা করছে চাঁদ—একদিন তা বেরিয়ে আসবে সময়ের ঘোমটা ছিঁড়ে। আজ সেই উন্মোচন। আজ সে চাঁদকে পেয়েছে—তার বুকের মধ্যে, তার বুকের মধ্যে। তা তাকে সম্পূর্ণ করে' তুলবে, ফিরিয়ে আনবে তার অখণ্ডতা। এইবার তার মুক্তি।

৮

আর সেই চাঁদ মিহিরকে ভরে' তুললো। যে-চাঁদ আমাদের রক্তের সমুদ্রকে আকর্ষণ করে, যার সঙ্গে আমাদের রক্তের চিরকালের অতীন্দ্রিয় সংবেদন। সেই সুদূর, সেই মধুর, সেই নিষ্ঠুর চাঁদ! যা আমাদের উতলা করে, উদ্‌ভ্রান্ত করে; ঘুমের মত যা নরম, হত্যার মত যা তীব্র; বিরহ-রাত্রির মত মদির, সমুদ্রের মত হিংস্র; যার স্পর্শে রক্তে বিষ জ্বলে' ওঠে, যার স্পর্শে অনির্ব্বচনীয় শান্তি; যার জন্য আমরা মরতে পারি, যার জন্য আমরা তারা হ'য়ে উঠতে পারি; যা আমাদের মধ্যে প্রেরণ করে অদ্ভুত খেয়াল, অসম্ভব কল্পনা; যার জন্য আমরা দুঃসাহস করতে পারি, নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি আমাদের চরম নিজস্ব। এবং যার জন্য, বিপর্য্যস্ত, উন্মথিত, উন্মত্ত, আমরা নিঃশেষ হ'য়ে যেতে পারি অপরূপ সর্ব্বনাশে।

আশ্চর্য্য, মিহির সহস্রবার নিজের মনে বললে, আশ্চর্য্য। হঠাৎ এ নেমে এসেছে প্রবল, অন্ধকার স্রোতে, ভেঙে পড়েছে তাদের উপর ক্ষুধিত সমুদ্রের মত। এখন আর-কিছু করবার নেই, কিছু ভাববার নেই। রক্ত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছে চিরন্তন চাঁদের টানে, লুটিয়ে পড়ছে তার শরীর-প্রান্তে—আকাশের অস্পষ্ট-শুভ্র চাঁদের মত সেই তার শরীর!

প্রায়ই সে যেতো তাপসীর কাছে। কখনো থাকতো দলের

কেউ—সাধারণ আড্ডা হ'তো। কখনো সেই ছোট ঘরে দু'জনে বসে' একটু-একটু করে' চা খেতে-খেতে আস্তে-আস্তে কথা বলা—এলোমেলো, খেয়ালি, অলস কথা—যখন যেমন মনে আসে। কোনোদিন তাপসীর কোনো বন্ধু আসতো গাড়ি নিয়ে: দল বেঁধে তারা যেতো সহরের বাইরে, শীতের ঝলোমলো সকালবেলায়, রাস্তার উপর হালকা-নীল কুয়াশা, বাতাসে ধার। গাড়ি ছুটতো ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল যশোর রোড দিয়ে, বাতাস মুখে লাগতো চাবুকের মত, আঙুলের ডগাগুলো অসাড় হ'য়ে উঠতো: তাপসীর খোঁপা পড়তো ভেঙে, বিস্ফারিত হ'তো চোখ, পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে হঠাৎ সে উচ্চস্বরে হেসে উঠতো। আর তার পাশে বসে' মিহির অনুভব করতো যা এর আগে সে কখনো অনুভব করেনি। এই উজ্জ্বল আকাশের মধ্যে প্রসারিত হ'য়ে সে অস্পষ্ট দিগন্তে মিশে গেছে—এই আকাশ তো সে-ই, সে-ই এই বিশ্ব, বিশ্বের প্রাণ-কেন্দ্র সূর্য্য। বাতাসে কী নেশা, এই আলো-কে সে শোষণ করছে মদের মত। সে মাতাল হ'য়ে উঠতো তাপসীর চুলের গন্ধে, তার মুখের কথা কবিতা হ'য়ে উঠতে চাইতো। সে ঠাট্টা করতো, সে হেসে উঠতো, সে কী বলতো জানতো না। সে যেন চোখের সামনে দেখতে পেতো সমুদ্রে-ঘেরা সবুজ দ্বীপ; বিশাল, কালো নদীর উপর দিয়ে আস্তে-আস্তে চলেছে মাস্তুল-উঁচোনো জাহাজ; অদ্ভুত সমুদ্রের জীব, উদ্ভিদের মত দেখতে; সৌরভময়, তারাময়

আফ্রিকার জ্বলন্ত রাত্রি। উদ্দাম হ'য়ে উঠতো তার কল্পনা, যা কিছু সে পড়েছে আর ভেবেছে, যা-কিছু সে লোকের মুখে শুনেছে, যত ছবি ঘুমের আগেকার মুহূর্ত্তে মনে-মনে সে তৈরি করেছে—সব যেন এক নিবিড় কেন্দ্রীভূত মুহূর্ত্তে একসঙ্গে ভিড় করে' আসতো—আর সেই আনন্দে মগ্ন, মুহূর্ত্তের জন্য তাপসীকেও সে ভুলে' যেতো।

কি কখনো সমস্ত দিন তারা বাইরে থাকতো, কোনো রবিবার, দল একটু বড় করে' নিয়ে চন্দননগর কি ডায়মণ্ড হার্বর। একটা আগুনের রেখার মত কেটে যেতো ঘণ্টাগুলো। মিহিরের সমস্ত শরীর আনন্দে শিরশির, শিরশির করতো। এত হাসি যে কোথা থেকে আসে! যখন সে খেতো, যখন সে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসতো, যখন সে তীরের মত ছুটে-যাওয়া কাঠবিড়ালির দিকে তাকাতো, যখন পায়ের নিচে শুকনো পাতাগুলোকে গুঁড়ো করে' দিতে-দিতে হাঁটতো—সমস্তই যেন আশ্চর্য্য, বিশেষ-কিছু, চোখে যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা থেকে অন্য-কিছু। তারপর বিকেলের দিকে ক্লান্ত, ধূলি-মলিন, রুক্ষচুলে শুষ্কমুখে বাড়ি ফিরে আসা—সূর্য্যময় হৃদয় নিয়ে। এত ভালো লাগতো যে শরীর-ভরা ক্লান্তি নিয়েও রাত্রে শুতে যেতে ইচ্ছে করতো না, ঘুম আসতো না বিছানায় শুয়ে।

আর কখনো-কখনো, আর কেউ না-থাকলে, দু'জনে তারা বেরুতো—কোথায়, তা'তে কিছু এসে যায় না। যে-কোনো রাস্তা,

যে-কোনো জায়গা—যতক্ষণ তারা একসঙ্গে থাকে। তাপসী ভালোবাসতো শীতের ছুপুরে ঘুরে বেড়াতে—নিছক বেড়ানো, কোনো উদ্দেশ্য না নিয়ে। ভালোবাসতো ট্রামের জানলা দিয়ে ময়দানের দিকে তাকাতে, ভালোবাসতো চৌরঙ্গি। কখনো তারা মার্কেটে গিয়ে খামকা কোনো জিনিস কিনতো, কখনো যেতো মিউজিয়মে, মানুষের ক্রমবিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্তরের কঙ্কাল দেখতে—ক্লান্ত বোধ করলে কোনো দোকানে ঢুকে পড়তো চায়ের জন্য। কলকাতাকে তারা যেন নতুন করে' আবিষ্কার করলে।

এমন বিষয় নেই তারা যা আলাপ না করতো। শুধু একটা কথা তারা ছ'জনেই এড়িয়ে চলতো, মিহিরের বাড়ির কোনো প্রসঙ্গ কখনো উঠতো না। তাপসী কোনো প্রশ্ন করতো না, মিহির দৈবক্রমেও কিছু বলতো না। সেই একমাত্র নিষিদ্ধ ক্ষেত্র, যেখানে তারা কখনো ঢুকতে পারবে না। সমস্ত কলকাতা তাদের, কিন্তু ঐ ছোট একটুখানি জায়গা চিরকাল বাইরে থাকবে। মিহির কখনো তাপসীকে তার বাড়িতে আসতে বলতো না; এবং তার বিসদৃশতা তাপসীর যেন চোখেই ঠেকতো না। সত্যি সে কিছু ভাবতো না, অবাক হ'তো না; সে ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছিলো। তাতে কী এসে যায়? সে-ও কখনো ভদ্রতার ছলেও মিহিরের কাছে তার স্ত্রীর উল্লেখ করতো না। বুঝতে

পারতো, সে তা চায় না। কেন চায় না? কী হবে ভেবে? আর ভাববার সময়ই বা কোথায়।

শুধু এই ব্যাপারে দু'জনের নিশ্ছিদ্র স্তব্ধতা—কোথাও তার এতটুকু চিড় নেই। তাই বলে' সেটা কোনোরকম ভার হ'য়ে ছিলো না তাদের মনে; তারা তা একেবারে ভুলে'ই থাকতো। তাপসীর এ-কথা কখনো মনেই হয়নি যে সে অন্য কারো অধিকার লঙ্ঘন করছে। আর মিহির কখনো ভাবতো না তার নিজের জীবনের উপর মৃণালের কোনো দখল আছে। মৃণাল তা চেয়েছিলো, তার অন্ধ, নিষ্ঠুর স্ত্রীত্বে সে তাকে জড়াতে চেয়েছিলো। আর নয়—সেই শ্বাসরোধকারী স্ত্রীত্ব আর নয়। নিজেকে সে ছাড়িয়ে এনেছে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নিজেকে সে ছাড়িয়ে আনতে পেরেছে।

অথচ মৃণালের উপর তার কোনো বিতৃষ্ণা হ'লো না। বরং, মৃণালের উপর যে-কঠিন ঘৃণা নিয়ে সে উঠে এসেছিলো রাত্রির গহ্বর থেকে, তা গলে' গেলো, মিলিয়ে গেলো। নিজেকে সে আর ঘৃণা করে না, তাই মৃণালকেও ঘৃণা করবার দরকার নেই। আর তার কোনো রাগ নেই কারো উপর। স্ত্রীর সঙ্গে সে আজকাল অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ; সহজে সে তার দিকে তাকাতে পারে, সহজে কথা বলতে পারে। সে তাকে পরাস্ত করেছে; এখন, তাই, তাকে অনায়াসে দয়া করা যায়। সে আর আসলে

আনবার মতই নয় ; তাই তাকে একটু স্নেহ করতে কোথাও বাধে না। যেমন আমরা স্নেহ করি পোষা বিড়ালকে, মাঝে-মাঝে তাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করি। স্ত্রীর প্রতি মনের প্রবল বিমুখতা যে সে কাটিয়ে উঠতে পারলে, তাতে তার উপর তার জয় সম্পূর্ণ হ'লো।

রাত্রে সে বাড়ি ফেরে, তাপসীতে আচ্ছন্ন হ'য়ে। মৃণাল অপেক্ষা করে' আছে চেয়ারে বসে', বরাবর যেমন করেছে। মিহির ঘরে ঢোকে, মুচকি হাসে। সে-হাসি মৃণালের জন্য নয় ; তবু, মৃণালের দিকে তাকিয়েই হাসে।

তার শব্দ শুনে হৈমন্তী উঠে আসেন :

'ক'টা বেজেছে রে ?

মিহির ঘড়ির দিকে না-তাকিয়ে বলে, 'এই সাড়ে দশটা হবে।'

'এত দেরি করিস কেন ?'

'দেরি হ'য়ে যায়।'

'এই শীতের মধ্যে মৃণাল বসে' থাকে।'

'থাকে কেন ? আমি কি বলি ?' তারপর বলে হেসে :

'না-হয় থাকলোই। তুমি যা করতে পারতে, মৃণাল তা পারবে না ?'

'আর-একটু আগে ফিরলেই তো হয়।'

'যতই দেরি করি, গরম ভাত তো নিশ্চিত।'

খেতে বসে' সে এমনি কয়েকটা কথা বলে। ভাসা-ভাসাভাবে, প্রায় নিজেই না-বুঝে। যে-সব কথা তার মনের নেহাৎই উপকার স্তরের। নিজে বলে' সে নিজেই শুনতে পায় না। সারাক্ষণ তার মনের মধ্যে চলেছে অন্য-কিছু। অন্য-কোনো সুর বেজে চলেছে তার গভীর চৈতন্যে, সারাক্ষণ।

খাওয়ার পর, অনেক রাত পর্য্যন্ত টেব্‌ল্-ল্যাম্পের ধারে মাথা নিচু করে' সে বসে' থাকে। বসে'-বসে' কবিতা লেখে। তাপসীকে স্মরণ করে', তাপসীর উদ্দেশ্যে। ছোট-ছোট কথাগুলো যেন রাত্রির বুক চিরে তাপসীর কাছে উড়ে চলে' যায়, এক ঝাঁক কালো পাখির মত—সেখানে, তাপসী যেখানে শুয়ে আছে, তার চুলের মত নরম অন্ধকার সমস্ত ঘর ভরে'। তার মনে হয়, তাপসী জানে। সে জানে যে রাত্রির এই স্তব্ধ মুহূর্ত্তে মিহির সমস্ত বিশ্বের মধ্যে একমাত্র তারই কথা ভাবছে। ঘুম আসছে না তারও চোখে। অন্ধকারে, মিহিরের এই কথাগুলোর পাখা-ঝাপটানি সে শুনতে পাচ্ছে। তার বিছানা ঘিরে তারা ঘুরছে, উড়ছে—ছোট-ছোট, কালো পাখির ঝাঁক। লুটিয়ে পড়ছে তার বুকের উপর। তাদের নরম উষ্ণতা তার শরীরে। আর মিহিরের মন অদ্ভুত এক পরিপূর্ণতায় উদ্বেল হ'য়ে ওঠে: তাপসীকে সে অনুভব করে, তার কাছে, তার চারদিকে, এই তার সমস্ত

রাত্রিতে। তাপসীর কাছ থেকে সে কখনো দূরে যেতে পারে না। সে প্রবাহিত হচ্ছে তাপসীর দিকে অন্ধকার, উষ্ণ স্রোতে, এই অদৃশ্য, অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়ে। সে ঝরে' পড়ছে তাপসীর উপর, নীরব অজস্রতায়, এই অনির্ব্বচনীয় অন্ধকারের মত।

আর ঘরের অন্যদিকে, অস্পষ্ট ছায়ারাশির মধ্যে, মৃণাল ঘুমিয়ে থাকে? ঘুমিয়ে? অন্ধকারের মধ্যে কালো চোখ মেলে', সে কি ভেবে-ভেবে অবাক হ'তে থাকে? সে কি সন্দেহ করে, সে কি বুঝতে পারে? সে কি প্রার্থনা করে? সঙ্কল্প করে? সে কি মনে-মনে কিছু বলে, অন্ধকারের কানে-কানে কিছু বলে? যা-ই হোক্, তাকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। সে ছায়াতে লীন। সে চির-অস্পষ্ট। আর দিনের বেলায় সে ঘুরে বেড়ায় সংসারের অসংখ্য কাজে, শান্ত, নিঃশব্দ, পোষা বিড়ালের মত। যেমন বরাবর সে করেছে। নিজেকে সে ঢেলে দেয়, ঢেলে দেয়, তার স্বামীর পরিচর্য্যায়। তা-ই সে পারে, তা ছাড়া আর কিছুই সে পারে না। মিহিরের শারীরিক জীবনের তুচ্ছতম খুঁটিনাটির উপর তার হাত। এমন কখনো হয়নি যে সে স্নানের শেষে বাথরুমের দরজায় তার চটি না পেয়েছে, কি বিকেলে বেরোবার সময় হাতের কাছে কুঁচোনো কাপড়। কিন্তু এতদিনে সে-সব তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো; কিছু আর তার চোখে পড়ে

না, গায়ে লাগে না। এ-কথা মনে করতেই সে ভুলে' গেলো যে মৃণাল রয়েছে এই-সমস্তর মূলে।

কিন্তু হৈমন্তী লক্ষ্য করছিলেন। মা-র চোখের মত ভয়ঙ্কর চোখ পৃথিবীতে আর নেই। দূরে থেকে, নিঃশব্দে, তীব্র, হিংস্র দৃষ্টিতে তিনি দেখছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর ছেলের অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ। আশঙ্কায় তাঁর বুক কেঁপে উঠলো। তাঁকে জানতে হবে। মিহিরের চোখের সেই উজ্জ্বলতাকে ম্লান করতেই হবে। অত সুখী হওয়া অন্যায়। এত সুখী হ'তে তাকে দেয়া যায় না—তাঁর কঠিন, একাগ্র মাতৃ-সত্তায় তিনি তা-ই ঠিক করলেন।

তাই একদিন সন্ধের সময়, একটু আগে মিহির তাপসীর কাছ থেকে ফিরেছে—দুপুরবেলায় তার সেখানে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিলো—হৈমন্তী ছেলের কাছে এসে দাঁড়ালেন :

'এতক্ষণে ফিরলি! চা খাবিনে?'

'না।'

'খেয়ে এসেছিস?'

'আচ্ছা, দাও এক পেয়ালা।'

'চা খেয়েছিস একবার?'

'ওঃ—সে কখন, এখন আর-একবার স্বচ্ছন্দে খাওয়া যায়।'

'কোথায় খেলি চা?'

'এই—ওদের বাড়িতেই।'

'ওখানেই ছিলি এতক্ষণ?'

মিহির তার মা-র মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে' রইলো। বিশ্রী লাগছিলো তার এ-সব প্রশ্ন। তার মা-র দাঁড়াবার ভঙ্গিটাও তার ভালো লাগলো না। তিনি যেন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, মনের মধ্যে কোনো স্থির সঙ্কল্প। কিন্তু কেন? নিজের কঠিন ঠাণ্ডা ইচ্ছাকে প্রসারিত করবার কেন এই চেষ্টা—সব সময়, সব সময়?

হৈমন্তী আবার জিজ্ঞেস করলেন: 'ওখানেই ছিলি এতক্ষণ?'

'ওখানেই ছিলুম।'

'কাদের বাড়ি—যেখানে গিয়েছিলি?'

'এক বন্ধুর বাড়ি।'

'কে সে?'

এতদিনের মধ্যে মিহির কখনো বাড়িতে তাপসীর নাম উচ্চারণ করেনি। সম্পূর্ণই যে ইচ্ছে করে' করেনি, তা নয়; কোনো দরকার হয়নি, কোনো কারণ ঘটেনি। কারণ ঘটলে হয়-তো করতো। তবে এটা ঠিক যে তাপসীর সম্বন্ধে বাড়িতে যে কিছু বলা হয়নি, তাতে সে খুসিই হয়েছিলো। সব কথাই বলতে হবে, তারই বা কী মানে আছে? কোনো-কোনো কথা হয়-তো না-বলাই ভালো।

হৈমন্তী আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কে সে?'

রাগে মিহির ম্লান হ'য়ে গেলো। মা তার উপর আবার তাঁর জোর খাটাতে চাচ্ছেন—তাঁর নির্মম ইচ্ছার জোর। তাকে উন্মোচিত, উন্মুক্ত না-করে' তিনি ছাড়বেন না। মা-র কাছে সে কখনো মিথ্যে বলতে পারে না, যেমন সে পারে না নিজের মাংসের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে দিতে। শারীরিকভাবে তা অসম্ভব। এবং হৈমন্তী তা জানেন। জেনে সেটা ব্যবহার করতে চান, নিজের উদ্দেশ্যে, নিজের অধিকার-লোভের চরিতার্থতায়।

আর, মিহির যতক্ষণ চুপ করে' আছে:

'তুই তো আজকাল মোটে বাড়িতেই থাকিস্‌নে', হৈমন্তী বললেন। মৃদুস্বরে, শান্তভাবে। তাঁর কথার সুরে কোনো অভিযোগ নেই, আক্ষেপ নেই। তিনি কেবল একটা ঘটনার উক্তি করছেন। শান্ত, নিশ্চল তিনি দাঁড়িয়ে, স্তম্ভের মত কঠিন। কেন্দ্রীভূত ইচ্ছার স্তম্ভ। আনত তিনি হবেন, না; তিনি বেঁকবেন না কিছুতেই। মিহির তাঁর দিকে তাকালো—আর তার শরীরের গাঁটগুলো যেন শিথিল হ'য়ে যেতে চাইলো।

তবু সে নিজেকে শক্ত করে' আঁকড়ে ধরলো। সে-ও ছাড়বে না। 'হ্যাঁ, শীতকাল—বেড়াতে বেশ ভালো লাগে', বেপরোয়া হালকাস্বরে সে বললে।

'তোর এই বন্ধু বায় বুঝি সঙ্গে?'

'অনেকেই যায়।'

'কে এই বন্ধু?' হৈমন্তীর মুখের একটি পেশী নড়ছে না; তাঁর চোখ ছেলের মুখের উপর স্থির-নিবদ্ধ, উদাসীন।

মিহির একটু চুপ করে' রইলো; তারপর আস্তে আস্তে, স্পষ্ট করে' বললে, 'তার নাম তাপসী। সে একটা কাগজ চালায়—আমি লিখি।'

'ও।'

মিহির আবার বললে, 'সে নিজেও লেখে—গ্যাখোনি—পল্লব কাগজে? প্রায়ই সে এখানে-ওখানে বেড়াতে যায়—আমাকে যেতে বলে সঙ্গে।'

এইবার হৈমন্তী বললেন: 'তা তুই তাকে মাঝে-মাঝে আসতে বললেই পারিস্। সেটা তো ভালোও দেখায়। না-বললেই ভালো দেখায় না।'

এটা মিহির আশা করেনি। অবাক হ'য়ে সে তার মা-র মুখে তাকালো। আ, তাঁকে হার মানানো সহজ নয়। তিনি গভীর। ফিরিয়ে দিতে তিনি জানেন। মিহির একটা সিগ্রেট ধরালে, তারপর বললে:

'বলবো একদিন।'

'একদিন তাকে চা খেতে বল্। মৃণালকে বলে রাখিস্—সব ব্যবস্থা করে' রাখবে।'

সূর্য্যমুখী

মিহির তার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। আ—সে বোঝে, মা-র প্রত্যেকটি কথার অন্তরালের তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত সে বোঝে। প্রত্যেকটি কথা বিষের কৌটার মত, তার রক্তে। রাগে ফেনিল হ'য়ে উঠলো তার রক্ত। কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই। সহ্য করতে হবে চুপ করে'। তার রাগ যে জ্বলে' উঠবে তীব্র কথায়, সে-সুযোগও মা তাকে দেবেন না। বিষের বুদ্‌বুদ গোপনে ফুটে উঠবে—বিষ বার করে' দেবার রাস্তাও খোলা নেই। বেশ, তা-ই হোক্ তবে। সে-ও কিছু বলবে না। চুপ করে' থাকবে। চুপ করে' সহ্য করবে। তার সহ্য করা দিয়ে মা-কে ব্যর্থ, বিপর্য্যস্ত করে' দেবে। দেখা যাক্, কার জোর বেশি।

তার জীবন বয়ে' চললো উতরোল উজ্জ্বল স্রোতে, তাপসীকে ঘিরে। কিছু সে ভাবলে না, এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়ালো না। চাঁদ যদি আকাশ থেকে নেমে এলোই, এমন ভীরু কে যে তাকে সমস্ত জীবন দিয়ে জড়িয়ে ধরবে না, তাকে নেবে না দু'হাত ভরে', হৃদয়ের অন্ধকার ভরে', সময়ের চিরন্তনতা ভরে'। তার জ্বলন্ত জ্যোতিতে অন্তরের নির্জ্জনতম ঘর ভরে' তুলবে না কে?

কিন্তু বাড়ির মধ্যে তার মা-র নীরব নিষ্পলক চোখ। সব সময় সেই দৃষ্টি তার পিছনে, সব সময়। তার সামনে সে স্বচ্ছ হ'য়ে যাচ্ছে, এ প্রবিষ্ট হচ্ছে তার হাড় পর্য্যন্ত। সব সময়, সব সময়। মিহির যখন চুল আঁচড়ায়, যখন খেতে বসে; যখন সে জলের

গেলাস মুখে তোলে, যখন টেবিলের উপর আঙুল চেপে ধরে' নখ পালিশ করে—সেই স্তব্ধ অক্লান্ত দৃষ্টি সব সময় তার পিছনে। তাপসীর উষ্ণ সৌগন্ধ্য থেকে সে যখন ফিরে থাকে, তার ভয় করে মা-র কাছাকাছি যেতে—সে যেন বিকীর্ণ করছে সেই সৌরভ, সে যেন বহন করে' এনেছে তাপসীর সত্তার নির্য্যাস। সে তা লুকোতে পারে না—লুকোতে সে চায়ও না। মা তার চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন—বুঝলেনই বা। বুঝলেনই বা—নিজের মনে সে জোর করে' বলতো। আর তবু সে এড়াতে চাইতো মা-র সেই প্রখর, নির্ম্মম দৃষ্টি। কিন্তু সে ভয় করে না; তার বুদ্ধিতে, তার বুদ্ধির শক্তিতে, সে ভয় করে না। সে চাইতো মা-র দৃষ্টিকে ভুলে' থাকতে, অস্বীকার করতে। এবং অস্বীকার করতো, ভুলে' থাকতো।

কিন্তু সব সময় পারতো না। যতক্ষণ সে তাপসীর সঙ্গে থাকতো, ততক্ষণ তার সম্পূর্ণ অখণ্ডতা। ততক্ষণ সে অনাক্রমণীয়, কিছু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। বাড়ি ফিরে এসে—সেই চোখ, সেই চোখ, সেই চোখ। তার বুদ্ধিবৃত্তির অতীত কোনো অন্ধকারে তা ফুটে রয়েছে। সে তাকে উপড়ে ফেলতে পারছে না, তাকে অন্ধ করে' দিতে পারছে না কোনো চরম আঘাতে। তা ফুটে রয়েছে—নির্নিমেষ, প্রশ্নহীন, চিরন্তন। তাকে ভুলে' থাকতে সে পারে না।

কিন্তু তাকে অস্বীকার তাকে করতেই হবে। আর, এক তাপসীই তাকে বাঁচাতে পারে, তাকে মুক্তি দিতে পারে মা-র দৃষ্টির সর্পিল সম্মোহন থেকে। সেখানেই—তাপসীর সেই উষ্ণ-সুরভি পরিমণ্ডলে—শুধু সেখানেই সে মুক্ত, সে চরম। তাই সে প্রতিহত তরঙ্গের মত ভেঙে পড়তো তাপসীর কূলে: যতক্ষণ পারতো, তারই সঙ্গে কাটাতো; বাঁচতো তারই মধ্যে; যখন চলে' আসতো, তখনও নিয়ে আসতো তার মধ্যে তাপসীর সূক্ষ্মতম সৌরভ।

৬

এমনি করে' কাটলো সেই শীত। মাঘ এসে পড়লো। লাল হ'য়ে উঠছে গাছের পাতা, আকাশ অবিশ্বাস্য নীল। হী-হী করছে উত্তুরে হাওয়া; তবু হঠাৎ মাঝে-মাঝে বঙ্গোপসাগরে কোনো বিপ্লব ঘটে, আর শীতের মাঝখানে দক্ষিণে হাওয়া বয়, দক্ষিণে হাওয়া বয়, মদির হ'য়ে ওঠে সন্ধ্যা, রাত্রি খুলে দেয় তার চুল, ছায়ায় আর গুঞ্জনে, সৌরভে আর রহস্যে সমস্ত পৃথিবী ভরে' যায়। আর মানুষের রক্তের মধ্যে কিসের উষ্ণ উন্মীলন, সেখানে কথা কয়ে' ওঠে কোন্ অস্পষ্ট বাসনা।

একদিন তারা বেড়াতে গেলো চিড়িয়াখানায়। কথাটা তাপসীরই মনে হ'লো। মিহিরকে সে বললে:

'জু-তে যেতে তুমি ভালোবাসো না?'

'খুব। আমার একমাত্র আপত্তি মানুষনামের জীবগুলোকে। সংখ্যায় তারা বড় বেশি।'

'এতই বেশি যখন, আরো দু'জন বাড়লে কিছু ক্ষতি হবে না। চলো। মিসেস্ হিপ্পোর একটি খোকা হয়েছে শুনলুম।'

সুতরাং তারা গেলো। বিকেল চুটো প্রায়। বড় দরজা দিয়ে ঢুকে তাপসী বললে, 'কোন্ দিকে?'

'একদিকে গেলেই হয়। এখন আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি।'

'মায় মাড়োয়ারি—এবং লাল মোজা পরা ভদ্রলোক', এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাপসী বললে।

প্রথমে তারা গেলো শিম্পাঞ্জিকে দেখতে। তারের জালে ঘেরা উঁচু খাঁচার মধ্যে নিঃসঙ্গ শিম্পাঞ্জি। কালো, বেঁটে, বুড়ো-হ'য়ে আসা—কোনো শিল্পীর উদ্দাম কল্পনা-প্রসূত মানুষের কার্টুন। সে বসে' আছে শরীরটাকে শিথিল করে' দিয়ে, দু'পা সামনের দিকে ছড়িয়ে। তার ডান হাত ঝুলে আছে পাশে, বাঁ হাত সে তুলে দিয়েছে কপালের উপর, দেখা যাচ্ছে তার কালো তেলোর গহ্বর, কানের উপর দিয়ে বেরিয়ে-পড়া লম্বা-লম্বা কালো-নখ। তার মুখে অপরিসীম জীবন-ক্লান্তি। সে তার দর্শকদের দিকে তাকাচ্ছে না; তার কালো মুখ গম্ভীর, আত্ম-বিস্মৃত। মিহির তিনবার হাত-তালি দিলে, কিন্তু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে না।

'বুদ্ধের মত দেখতে!' তাপসী বলে' উঠলো।

'কবির মত দেখতে,' মিহির বললে, 'যে-কবি চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। যে-মেয়ে তার প্রেমিকের প্রতীক্ষা করছে, তার মত। সত্যি বলতে, আমার মত—এবং তোমার মত।'

'দ্যাখো, আমাদের মনের ভাব অনেক, কিন্তু মুখের ভাব ধরা-বাঁধা কয়েকটা। রাগে আমাদের মুখ যেমন লাল আর চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, আনন্দেও তেমনি। যে-লোক এইমাত্র কারো সঙ্গে

তুমুল ঝগড়া করে' এসেছে, তাকে দেখে তোমার মনে হবে সে এইমাত্র তার প্রেমের স্বর্গ থেকে নেমে এলো।—শিম্পাঞ্জিটা কী ভাবছে, তোমার মনে হয়?

'ভাবছে—এই কুৎসিত জীবগুলো কারা, অনেকটা আমার মতই দেখতে, প্রাণপণে আমাকে নকল করবার চেষ্টা করে?'

তাপসী হেসে উঠলো।—'সুইফ্‌ট্‌-এর এই শিম্পাঞ্জিকে দেখা উচিত ছিলো।'

'সুইফ্‌ট্‌ হয়-তো কল্পনা করতেন একটা চিড়িয়াখানা—সেখানে মানুষ খাঁচার ভিতরে, আর পশুরা বাইরে। চিড়িয়াখানা বললুম কিন্তু তাকে জেলখানা বললে ভালো হয়, কি পাগলা গারদ, কি দুটোই একসঙ্গে। পশুরা দেখতো যে মানুষ খিদে না-পেলেও খায়; বলপ্রয়োগ করে স্ত্রীর উপর; ক্ষুধার নিবৃত্তি ছাড়া অন্য কারণে মারে; হত্যা করে পরস্পরকে—এবং অনেক সময় সেই হত্যাকারীদের স্মৃতিপূজা করে; দেখতো, তারা নিজেদের কল্পনার দাস, পাপের ভারে জর্জ্জর; ঈশ্বরকে তারা খোসামোদ করে ও উপঢৌকনে খুসি করতে চায়; দুঃখ তাদের নিজস্ব ও বিশেষ সৃষ্টি। আর তারা মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত শিউরে উঠতো—বলতো "কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!"'

'এই—দ্যাখো,' তাপসী মিহিরের হাতে মৃদু ঠেলা দিলে, 'ও

বোধ হয় বুঝতে পেরেছে যে আমরা ওর চেহারা নিয়ে আলোচনা করছিলুম।'

শিম্পাঞ্জিটা তার ভঙ্গি বদলেছিলো। হাত থেকে মাথা নামিয়ে এনে সে ভাসা-ভাসা, তীক্ষ্ণ চোখে তার দর্শকদের দিকে তাকালো। তার পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ ঝলসে উঠলো বড়-বড় দাঁতের সাদা আভা। তা মনে হ'লো অনেকটা ব্যঙ্গের হাসির মত। তার গোল ছোট কেশহীন মাথায় সে একবার হাত বুলোলে; তারপর একটু সরে' বসে' অত্যন্ত ক্লান্তভাবে চুপ করে' রইলো।

'ও কী করবে ভেবে পাচ্ছে না,' তাপসী বললে।

'ও জানে যে আমরা ওর খেলা দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। ওর মেজাজটা একটু দার্শনিক-ঘেঁষা, এ-সব ওর ভালো লাগে না।'

একজন দর্শক তারের জালে বাড়ি মেরে ডেকে উঠলো, 'হেই!'

শিম্পাঞ্জি মুখ ফিরিয়ে তাকালো, চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। তারপর, তার ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গে আবির্ভূত সার্কাসের খেলোয়াড়ের মত, আত্ম-সচেতন, কর্ত্তব্যপরায়ণ, উৎসাহহীন সে উঠে দাঁড়ালো, দু'পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ অদ্ভুত একটা মুখ-ভঙ্গি করলে। দর্শকরা হেসে উঠলো। বেড়া ঘেঁষে দাঁড়িয়ে করুণ, বিমর্ষ চোখে সে হাত পাতলো। একটা ওল্টানো হাঁড়ির মত তার পেট, তার হাত দুটো কুড়োলের মত ঝুলে রয়েছে, তার বেঁটে পায়ের লম্বা-লম্বা আঙুল দিয়ে সে অদ্ভুত, অসমান পা ফেলছে।

অত্যন্ত হাস্যকর, কিন্তু সে এত বেশি মানুষের মত দেখতে যে হাসির মধ্যে হঠাৎ থেমে গিয়ে অবাক হ'তে হয়।

মিহির একটা বর্ম্মা-চুরুট ধরিয়ে তারের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ফেলে দিলে। শিম্পাঞ্জি তৎক্ষণাৎ সেটা তুলে নিলে, মুখে দিয়ে প্রাণপণে টানতে লাগলো। উঠলো হাসির রোল। দুটি ছোট ছেলে আনান্দে চেঁচিয়ে উঠলো। কয়েকটা টান দিয়েই সে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

'বেচারা!' মিহির বললে, 'ও যদি একবার নেশার স্বাদ পেতো, তা হ'লে মানুষের প্রতি ওর একটু অন্তত শ্রদ্ধা হ'তো।'

দু'চার মিনিট শিম্পাঞ্জি তার দর্শকদের আপ্যায়ন করলে। খাঁচার উপরকার দিকে আড়াআড়িভাবে লাগানো কাঠ সে এক লাফে উঠে ধরে' ফেললো, ঝুলে রইলো, ঝুপ করে' পড়লো, চিৎ হ'য়ে শুয়ে রইলো তার উঁচু গোল পেট উপরদিকে তুলে দিয়ে, গড়াগড়ি গেলো, খানিকক্ষণ ডিগবাজি খেলো, মাথার উপর দাঁড়ালো। ছোট ছেলে দুটি হাসতে-হাসতে যেন মরে' যাবে। তারপর ততক্ষণে-নিবে-যাওয়া সেই চুরুটটা কুড়িয়ে নিয়ে চুপচপে বসে' সেটা ছিঁড়তে লাগলো, তার মুখে নিবিড় একাগ্রতা। যেন সার্কাসের খেলোয়াড় তার বাজি শেষ করে' ফিরেছে, এখন নিজের আমোদের জন্য কিছু করতে যাচ্ছে।

'চলো', মিহির বললে, ওকে এখন ওর বানরত্বকে ধ্যান করতে দাও।'

' "ঘেন্না হয়" ' তাপসী বললে, 'ও নিশ্চয়ই মনে-মনে বলছে, "ঘেন্না হয় এই মানুষগুলোকে দেখে। পরমবানরের কাছে সে প্রার্থনা করছে, "এই মূর্খদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করো।" '

লাল রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মিহির বললে: 'এক-এক সময় এ-কথা ভেবে সত্যি ভালো লাগে যে পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া অন্যান্য জন্তুও আছে।'

তারপর তারা গেলো পাখিদের ঘরে। বাইরে থেকে তাদের কানে এসে লাগলো একটা জড়ানো, মেশানো, বিশৃঙ্খল কিচির-মিচির। 'মেয়েদের সভার মত', মিহির বললে। 'সবাই বলবে, কেউ শুনবে না।'

এক আশ্চর্য্য জগৎ—রঙের আর শব্দের আর নরম পালকের। উজ্জ্বলতম সব রঙের তীক্ষ্ণ প্রতিঘাত। সাদা আর হলদে ফুটকিওয়ালা সাধারণ ছোট-ছোট পাখি থেকে দক্ষিণ আমেরিকার জ্বলন্ততম প্রতিনিধি—তাদের গায়ের রঙ চীৎকার করে' উঠছে, তাদের দীর্ঘ পুচ্ছ কৃত্রিম বৃক্ষশাখা থেকে প্রায় মেঝেতে এসে ঠেকেছে, রামধনু-রঙের অগ্নিশিখার মত। সমস্তটা জায়গাটায় যেন রঙের লুঠ লেগে গেছে।

'এত বড় পাখি আমার ভালো লাগে না,' তাপসী বললে।

'না। যে-পাখি গান করে, তার অদৃশ্য হওয়া উচিত।
যে-পাখি সুন্দর, তার ছোট হওয়া উচিত। কিন্তু এই তো
তোমার ছোটরা।'

'একটা ঘর ভরে' অসংখ্য ছোট পাখি—তারা লাফাচ্ছে,
উড়ছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে, তাদের ছোট শরীরের পক্ষে যতটা
সম্ভব চ্যাচামেচি করছে। ছোট-ছোট রঙের ঢেউ, সব জড়িয়ে
রঙের অবিশ্রান্ত একটা ফোয়ারা। তাপসী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে
দেখলো, তারপর বললে :

'হাজার হোক্, শিম্পাঞ্জিটা খানিকটা মানুষ তো। একটু
দার্শনিক গোছের না হ'য়ে সে যায় না। তার চোখের ভাষা,
তার ভঙ্গির অর্থ আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু এই পাখির জগত
একেবারে আলাদা। সত্যি তাদের কোনো ভাবনা নেই। তারা
বিশেষ-কিছু নয়। শুধু একমুঠো রঙিন, উষ্ণ প্রাণ। তারা
কেবল বাঁচে, সেইজন্য তারা এত সুন্দর। ঘরের মধ্যে একটা পাখি
ঢুকলে আমাদের ভালো লাগে। কেন? হয়-তো একটু স্পর্শ
ভেসে আসে সেই নিবিড় উষ্ণতার। পাখি ভাবে না, আশা করে
না, ফন্দি আঁটে না। সে শুধু পালকে জড়ানো একটু প্রাণ-স্পন্দন।'

'পাখিকে মনে হয় বিধাতার খেয়ালের সৃষ্টি।'

'আর আমরা তাঁর সঙ্কল্পের—না, কী? আমরা তাঁর পরিপূর্ণতার
কাঠামো। মাঝে-মাঝে পাখি হ'তে পারলে মন্দ হ'তো না।'

সূর্য্যমুখী

এক জায়গায় কয়েক জোড়া আশ্চর্য্য রঙিন লাভ্‌বার্ড, যুগলে বসে' তারা অবিশ্রান্ত ঠোঁট দিয়ে ঠোকাঠুকি করছে। মাঝে-মাঝে তারা জায়গা বদল করছে, সঙ্গী বদল করছে না কখনো। মিহির একটু তাকিয়ে থেকে বললে :

'যদি এক ও অবিচ্ছেদ্য বিবাহে বিশ্বাস জন্মাতে হয়, তা হ'লে এই পাখিদের লক্ষ্য করা সব চেয়ে ভালো। আমাদের নীতি-প্রচারের পদ্ধতি বদলানো দরকার।'

'সারাদিন ধরে' এরা প্রেম করছে! এদের ক্লান্তি লাগে না কখনো?'

'তার চেয়েও আশ্চর্য্য, এরা যে পরস্পরকে মেরে ফেলে না। কিন্তু আমাদের নিজেদের মানে এদের বিচার করতে গেলে চলবে না। তা ছাড়া, এ-জিনিস মানুষের মধ্যেও খানিকটা আছে বই কি। শিম্পাঞ্জি এ-রকম প্রেম করতে পারে না, তবু মানুষ পারে। মনে করতে হবে, পাখিদের কাছ থেকেই সে শিখেছে। জীবতত্ত্বের হিসেবে যা তার নিছক স্বভাব নয়, এমন অনেক জিনিস সে নিয়েছে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে। মানুষ এই পৃথিবীর মাইক্রোকজ্‌ম্‌। সত্যি, মানুষের মত আশ্চর্য্য জীব আর নেই।'

সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে মিহির আবার বলতে লাগলো :

'মানুষ আরম্ভ করেছিলো অনুকরণ দিয়ে। সেটা বুদ্ধির প্রথম

স্তর। অনুকরণ করবার ক্ষমতা মানুষ আর বানর ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর নেই। কোনো নক্সার সঙ্গে অবিশ্রান্ত নিজেকে মিলিয়ে নিতে-নিতে একদিন সেটাই স্বভাবের অংশ হ'য়ে পড়ে।'

সাপ আর কুমীর, হিপ্পো আর গণ্ডার শেষ করে' তারা এলো বিরাট মাংসভুকদের কাছে। উৎকট গন্ধে বাতাস ভারি। ভিড় সেখানেই সব চেয়ে বেশি। দর্শকরা কেউ-কেউ নাকে রুমাল চাপছে, কিন্তু তাদের মুগ্ধ চোখ সরিয়ে আনতে পারছে না। 'জীবনের এটা একটা মস্ত আনন্দ', মিহির মন্তব্য করলে, 'কোনো ভয়ঙ্কর বস্তুর এত কাছাকাছি থাকা, অথচ সত্যিকারের কোনো বিপদ নেই। অভিনয় দেকে কান্নার মত। দুঃখের কষ্টটা না পেয়ে দুঃখের রোমাঞ্চটা পাওয়া। অত্যন্ত উঁচুদরের থ্রিল।'

'হয়-তো', তাপসী বললে, 'হয়-তো বন্দী বাঘ দেকে আমরা পরোক্ষ খানিকটা তৃপ্তি পাই—যে এমন ভয়ঙ্কর, তার এই দুরবস্থা দেখে নীচ গোছের উল্লাস। লোকগুলোর মুখের ভাব যেন এই—কেমন জব্দ? এইবার কেমন!'

'সে তো স্বাভাবিক। স্বভাবতই যে জয়ী, সে তার জয়ের কোনো হিসেবই রাখে না। দুর্ব্বল একবার কোনোরকমে প্রবলকে পরাস্ত করতে পারলে তার আস্ফালন সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়।'

সূর্য্যমুখী

'বাঘ মারবার জন্ম মানুষের কী সাংঘাতিক তোড়জোড়। রাজা-মহারাজারা কাগজে চিঠি লেখেন, যাতে জঙ্গলের উপর কারো হাত না পড়ে। তাদের মারবার জন্ম বাঘকে অক্ষয় ও নিরাপদ রাখা চাই।'

তারা একটা বাঘকে দেখছিলো, সেটা নতুন এসেছে। খাঁচার মধ্যে অবিশ্রান্ত কোণাকুণি পায়চারি করছে, উজ্জ্বল, জ্বলন্ত এক জন্তু, প্রতিটি পেশী যেন ইস্পাতের তৈরি। বার্নিশ-করা সোনার উপর ঘন কালো ডোরা-কাটা তার শরীর। সুন্দর, যে-রকম সুন্দর এক বন্য পশুই হ'তে পারে। দেখতে মনে হয় বিড়ালের মত নরম, লীলায়িত; কিন্তু তার আড়ালে রয়েছে প্রচণ্ড, অপরিমেয় শক্তি।

'আশ্চর্য্য', তাপসী মুগ্ধস্বরে বলে' উঠলো, 'আশ্চর্য্য।'

'আশ্চর্য্য', মিহির পুনরাবৃত্তি করলে। 'যদি কখনো রাত্রে তোমার ঘুম না আসে, তাপসী, তুমি ভেড়ার পালের কথা ভেবো না। সাদা মেঘের কথা ভেবো না। কি ফুলের বাগানের, কি বিকেলে নৌকোর গায়ে নদীর জলের ছল্‌ছলানির। বাঘের কথা ভেবো, উজ্জ্বল, নিঃসঙ্গ বাঘ। রাত্রির কালো অরণ্যে আগুনের মত বাঘ জ্বলছে। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, সমস্ত রাত্রি ভরে', নিঃশব্দে। ভাবো তার কথা! ভাবো তার প্রবল, অন্ধকার জীবনের কথা। আপনাতে সে পরিপূর্ণ। সে মগ্ন

তার নিজের জীবনের মধ্যে। তার জীবনের অন্ধকার স্রোত বয়ে' যাচ্ছে রাত্রির ভিতর দিয়ে, নিবিড় অরণ্যকে প্লাবিত করে'। সে লোভ করে না, যেটুকু তার দরকার তার বেশি নেয় না। সে ভালোবাসে না, ভালোবাসার চেষ্টায় সে হাঁপিয়ে ওঠে না। আর সে হিংসা করে না, মারতে যায় না। সে মারে, যখন তার দরকার; কিন্তু মারতে সে চায় না, মনে-মনে সে কথনো বলে না, "আমি ওকে মারবো, আমি ওকে মারবো।"

'আর সেই বাঘকে আমরা মারি, আশ্চর্য্য উজ্জ্বল সেই বাঘ, হাতির পিঠে চড়ে', একশো লোকজন নিয়ে, তীব্র হিংস্র আলো দিয়ে তাকে বিঁধে। বাঘের চোখের দিকে তাকিয়ে ত্থাখো, সবুজ মশালের মত চোখ। আর স্ত্রীলোকের চোখের সম্মোহন সেই চোখে। তার দিকে তাকিয়ে থাকলে তুমি চোখ ফেরাতে পারবে না। হয়-তো, যদি যথেষ্ট দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকতে পারো, বাঘ তোমাকে চিনবে, এসে দাঁড়াবে তোমার কাছে মাথা নিচু করে', তুমি হাত দিয়ে ওর ঘাড়ের নরম উষ্ণতা অনুভব করতে পারবে। কিন্তু তার সেই সম্মোহনকে আমরা আমরা ভয় করি। তা থেকে চোখ ফেরাই, তাকে নষ্ট করে' দিতে চাই, উপড়ে ফেলতে চাই। আমরা জানি যে তার চোখের সেই আগুনকে প্রথমে মারতে না পারলে তাকে আমরা মারতে পারবো না। আর সেইজন্যেই তো তার মুখের উপর ফেলি

ইলেকট্রিক টর্চের তীব্র আলো। আর তারপর বন্দুক ছুঁড়ি। আমরা ভয় করি, তার চোখকে আমরা ভয় করি। কেননা আমাদের চোখে যে আলো নেই। আমাদের চোখ মরা। বাঘ যে আমাদেরকে খেয়ে ফেলে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।'

'বাঘটা একবার তাকাচ্ছে না আমাদের দিকে', তাপসী বললে, 'আমাদেরকে লক্ষ্যই করছে না।'

'ভদ্রমহিলাকে অপমান!' মিহির হেসে উঠলো, 'এবারে সরি, চলো। বড় লোক জমছে।'

বাঘের দিকে শেষ দীর্ঘ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে তাপসী সরে' এলো। ভিড় ঠেলে' তারা আস্তে-আস্তে এগোলো। কয়েকটা দরজা পরে একটা সিংহ। দেখেই মনে হয় বয়েস হয়েছে। কেশর গেছে ঝরে'। ফিকে হ'য়ে এসেছে গায়ের বাদামি-ধূসর রঙ। চলে' বেড়াবার পর্য্যন্ত উৎসাহ নেই, আধ-শোয়া অবস্থায় আধ-বোজা চোখে ঝিমোচ্ছে।

'দেখে কষ্ট হয়', তাপসী বললে। 'সিংহকে যেন কিছুতেই চিড়িয়াখানার মধ্যে খাপ খাওয়ানো যায় না।'

'তবু—ওর মাথাটা একবার দ্যাখো, ওর পেট, ওর কোমর। এদের দেখলে মনে হয় মানুষই হচ্ছে সৃষ্টির কলঙ্ক।'

'সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতায়, অন্তত, একেবারে শেষের বেঞ্চিতে তাতে সন্দেহ নেই।'

একটু নড়ে চড়ে' বসে' সিংহ এক বিশাল হাই তুললো। দেখা গেলো তার মুখের বিশাল গুহা। তার প্রকাণ্ড চওড়া জিহ্বা সাদাটে, কর্কশ; দু'পাশের কোণাচে কুকুর-দাঁত ছুরির ডগার মত ধারালো। প্রায় আধ মিনিট সে রইলো মুখ খুলে; তারপর মাথা নামিয়ে নির্গত করলে অস্ফুট শব্দ।

'কিছু ওর ভালো লাগছে না,' তাপসী বললে।

খানিক্ষণ তারা সিংহকে দেখলো। সে যেন মরে' যাচ্ছে, দেখে এমনি মনে হয়। একটা শিথিল চাবুকের মত পড়ে' আছে তার লেজ। মাঝে-মাঝে লেজের প্রান্তদেশে খর্ব্ব কেশগুচ্ছের ক্ষীণতম আন্দোলন। তার কোনো উৎসাহ নেই—কোনো দুঃখও নেই। তার বন্দী অবস্থার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ পর্য্যন্ত করে না। তার প্রাণ-শক্তি চুঁইয়ে-চুঁইয়ে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্ত্তে, একটু-একটু করে'। সে যেন নিজেকে শান্তভাবে গুছিয়ে নিয়েছে মরবার জন্য। চিরকালের মত বিশাল এক ক্লান্তি তাকে আচ্ছন্ন করেছে। কোনো রাগ তার নেই, কোনো আশা, কোনো অনুশোচনা। তাকে ঘিরে রয়েছে নিঃসীম নিঃস্পন্দ শূন্যতা। সি-সি মাছির কামড় যে খেয়েছে সেই অফ্রিকাবাসী যেমন তার বাড়ির দোর-গোড়ায় শুয়ে-শুয়ে মরে—মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দিনের পর দিন, অবিশ্রান্ত, মন্থর, একটু মধুরভাবে, এমন কি—তেমনি মরছে এই সিংহ, বিনা কষ্টে, বিনা চেষ্টায়,

ইচ্ছা না-ক'রে', প্রতিরোধ না-ক'রে', নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ ক'রে'।

তাপসী বললে, 'মন-খারাপ হ'য়ে যায় বেশিক্ষণ দেখলে।'

'এসো মন ভালো করা যাক,' ব'লে' মিহির তাকে সে-সব জায়গায় নিয়ে গেলো, যেখানে রয়েছে বিশুদ্ধ কমিক জীবেরা, যারা নিছক বাড়াবাড়ি, সুকুমার রায়ের ছবির মত। জিরাফ আর বাইসন, উটপাখি আর অতিকায় কচ্ছপ, ফ্লেমিংগো আর ক্যাঙারু। তারপর ঘুরে-ঘুরে তারা এসে উপস্থিত হ'লো যেখানে খালে-ঘেরা খোলা জায়গায় ওরাং-ওটাং দম্পতী সুখে বসবাস করছে, 'পৃথিবীর বৃহত্তম ইঁদুরে'র সঙ্গে নিবিড় বন্ধুতায়।

'যাক,' তাপসী বললে 'আমাদের আত্মীয়দের কাছে ফিরে আসা গেলো।'

'যদিও শিম্পাঞ্জির মত অত নিকট নয় বোধ হয়।'

'দেখেই বুঝতে পারছি। শিম্পাঞ্জিটা দস্তুরমত অসুখী। অসুখী হবার ক্ষমতা ওর খুব বেশি পরিমানেই আছে, মনে হয়। আর এদের ছাখো—কী-রকম স্ফূর্ত্তিবাজ।'

সত্যি, ওদের দেখে মনে হয় সুখী কুকুরের মত স্ফূর্ত্তিবাজ। প্রায় মানুষের সমান লম্বা, মানুষের দ্বিগুণ চওড়া, পাঁশুটে রঙ, মুখের ভাব হাসিখুসি, বেপরোয়া, এই বানর-যুগল অবিশ্রান্ত খেলা করছে, মুখ ভ্যাঙ্‌চাচ্ছে, লাফাচ্ছে, গড়াচ্ছে, কৃত্রিম ডাল থেকে

ডালে, সমস্তটা ফাঁকা জায়গা ভরে'। কখনো দু'জনে জড়াজড়ি করে' গড়াতে-গড়াতে থালের ধারে এসে ঠেকছে, কখনো একজন রাত্রিতে থাকবার ঘরের পিছনে লুকোচ্ছে, আর-একজন ফিরছে তাকে খুঁজে—তারপর হঠাৎ পিছন থেকে মাথার উপর এক চাঁটি। তাদের নড়াচড়ায় এমন ছন্দ, যেন স্প্রিং-এ চলছে তাদের শরীর।

'আস্ত দুটো ক্লাউন,' তাপসী হাসতে-হাসতে বললে।

'শিম্পাঞ্জিটাও মাঝে-মাঝে ভাঁড়ামি, করে, কিন্তু সে হয়-তো জানে যে সে ভাঁড়ামি করছে, হয়-তো খানিকটা ইচ্ছে করে'ই সঙ্ সাজে। কিন্তু ওরাং-ওটাং তা জানে না। এরা একেবারেই জন্ম-সঙ্।'

'উঃ', তাপসী বলে' উঠলো, 'কতরকম কসরতই ওরা জানে! কিন্তু কী ওদের ভঙ্গিতে শ্রী।'

'এমন অনুমান করলে ভুল হয় না বোধ হয় যে এদের দেখেই মানুষ নাচতে শেখে। কী-রকম মাপা চাল, দেখেছো, এতটুকু খুঁত নেই। আর মানুষের চলাফেরা বেতালা, মানুষের দেহে এত সহজ গতি নেই। কিন্তু সে সেটা পুষিয়ে নিলে। শিখলে নাচতে। অসভ্যদের নাচ, মোটারকম হার্লেকুইন নাচ, আজকালকার কাবারে নাচ তো এদেরই অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ। তা-ই মনে হয় না তোমার?'

সূর্য্যমুখী

'কেবল একটা কথা মনে হয়। কাবারে এদেরকে হার মানিয়েছে শতগুণে', বলে' তাপসী হেসে উঠলো।

খানিকক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। বিকেল হ'য়ে এলো; শোনা যাচ্ছে মাংসভুকদের গর্জ্জন। জন্তুদের খাবার সময়। বাগানের লোক এলো হাতে একটা বদ্‌না, রুটি আর কলা নিয়ে। তক্তার সাঁকো পার হ'য়ে সে গেলো ওরাং-ওটাং-এর উপনিবেশে। রাখলো একটা কলাই-করা থালা খানিকটা খরগোস খানিকটা ইঁদুরের মত দেখতে সেই অদ্ভুত, নামহীন জন্তুর সামনে। এতক্ষণ সে নিশ্চল হ'য়ে পড়ে' ছিলো, বাদামি একটা পাথরের মত, তার বাঁকানো শরীর মোটা-মোটা রোঁয়ায় আচ্ছন্ন। এত ছোট তার মাথা যে দেখা যায় না; বোঝা যায় না চোখ আছে কি নেই। এইবার থালার কাছে মাথা নিয়ে সে খেতে লাগলো, কুট-কুট করে', তার ছোট-ছোট ধারালো দাঁত দিয়ে আশ্চর্য্য দ্রুতবেগে। প্রায় অদৃশ্য ভাবে সে খেলো, শুধু তার ছুঁচলো ঠোঁট সক্রিয়, বাকি সমস্ত শরীরে একটুকু নড়াচড়া নেই। তার নিশ্চলতার সঙ্গে ওরাং-ওটাংয়ের অক্লান্ত উচ্ছলতার প্রতিঘাত একটা দেখবার জিনিস।

লোকটাকে দেখতে পেয়েই বানর-দম্পতী ছুটে এলো তার কাছে, হাত থেকে কেড়ে নিতে চাইলো খাবার। লোকটা একটার

গালে মারলে এক চড়, তারপর খাদ্য বিতরণ করে' দিলে সমান করে'। একটানে ছিঁড়লো কলার খোসা, আস্ত রুটি আর কলা চলে' গেলো তাদের মুখে। লুব্ধ আনন্দে তারা চিবোতে লাগলো তাদের ফুলে-ওঠা গালের পেশীগুলো দ্রুত ওঠা-পড়া করছে, তাদের চোখের তারা প্রায় ভুরুতে এসে ঠেকেছে। তারপর খাবার গেলা হ'য়ে গেলে, তারা নিজে থেকেই লোকটির সামনে এসে দাঁড়ালো হাঁ করে', পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে, আকাশে চোখ তুলে। লোকটি তাদের গলার মধ্যে ঢেলে দিলে আফিম-মেশানো পাৎলা চা; তারপর 'ইঁদুরে'র সামনা থেকে থালাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে' আসতে লাগলো। একটা ওরাং-ওটাং এলো তার পিছন-পিছন, কেবলই মুখ আর হাত বাড়াতে লাগলো। লোকটি মুখ ফিরিয়ে দিলে তাকে এক ধমক, দ্রুতপদে সাঁকো পার হ'য়ে এসে একটানে তক্তাটা তুলে নিলে।

তাপসী বললে, 'দেখে মনে পড়লো। চা না খেলে আর তো বাঁচিনে।'

'চলো যাই।'

পথের উপর গাছের ছায়া পড়েছে দীর্ঘ হ'য়ে, বিকেলের হাওয়ায় কাঁপছে পাতাগুলো। ঝকঝকে রোদে হেসে উঠেছে সমস্ত বাগান। চায়ের দোকানের দিকে যেতে-যেতে:

সূর্য্যমুখী

'চিড়িয়াখানা হচ্ছে পিউরিটানের ইস্কুল', মিহির বললে। 'এখানে এলে একটা কথা অন্তত সে বুঝতে পারবে, যা সে ভুলে' থাকতে চায়, ভুলে' থাকবার প্রাণ-পণ চেষ্টা করে—যে মানুষ কাপড়-চোপড় নিয়েই জন্মায় না। এই সহজ কথাটা একবার মেনে নিতে পারলে এত অসুখী সে হ'তো না, অন্যের জীবনও তুলতো না বিষময় করে'। আর তাহ'লে সে তার নিজের শরীরকে ভালোবাসতে পারতো। তা পারে না বলে'ই সে এক মুহূর্ত্তের শান্তি পায় না জীবনে। তার যে একটা শরীর আছে, এ-কথা ভাবতে তার অসহ্য লাগে। নিজেকে ঘৃণা করে সে-জন্য।

'কিন্তু সে এই পশুদের দেখতো—নিজের শরীরের মধ্যে তাদের কী নিবিড় সম্পূর্ণতা। দেখতো তাদের শ্রী, তাদের স্বাচ্ছন্দ্য, তাদের নির্লিপ্ততা। তারা প্রত্যেকে এক-একটি অচেতন প্রাণের দ্বীপ; তারা মুক্ত; অন্ধকারে, তারা প্রত্যেকে পরিপূর্ণ নিজের জীবনে। বনে-জঙ্গলে তারা থাকে, ঝোপে-ঝাড়ে, মাঠে আর গাছে—তারা বিভিন্ন, তারা অসংখ্য। কিন্তু একজন আর-একজনকে এড়িয়ে চলে, প্রত্যেকের জন্য তার নিজস্ব, অতুলনীয়, অপরূপ জীবন। তারা কেউ কাউকে ঘাঁটাতে আসে না, ভাগ বসাতে চায় না অন্যের জীবনে, নিজের জীবনের ভাগ দিতে যায় না অন্যকে। মানুষের পক্ষে এটা কী শিক্ষা, ভাবো! জীবন থেকে চরমতম নিঙড়ে নেবার চেষ্টায় জীবনকে

তারা নষ্ট করে না। তাদের মধ্যে শান্তি ; আদিম বিশাল ধৈর্য্য। বুঝি বা কিছু হারালুম—এ-ভয়ে তারা কাতর নয়। নিজের নিঃসঙ্গতাকে তারা ভয় করে না : নিজেকে তারা ভয় করে না। তারা যা নয়, তা ছাড়িয়ে অন্য-কিছু হ'য়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। অত্যাচার করে না নিজের উপর, নিজেকে হত্যা করতে চায় না। "They do not lie awake at night and weep for their sins." '

তারা যাচ্ছিলো আঁকাবাঁকা খালের পাশ দিয়ে। হঠাৎ তাপসী বললে :

'এসো না এখানে একটু বসি। চা না-হয় একটু পরেই খাবো।'

'হয়-তো আর সময় থাকবে না।'

'তা হ'লে বাড়ি গিয়েই খাবে। কিন্তু এখানে একটু বসি, এসো। কী যে ক্লান্ত লাগছে, তুমি ভাবতে পারবে না।'

রাস্তা থেকে নেমে দু'জনে হাঁটতে লাগলো ঘাসের উপর দিয়ে। খালের একেবারে ধারে এসে তারা বসলো, ঘাসের উপর, তাদের একদিকে ঘন গাছের সারি সোনালি আলোয় ঝলোমলো। বিকেল ঘনিয়ে আসছে, দীর্ঘতরো হ'য়ে আসছে ছায়া। খালের স্বচ্ছ, স্তব্ধ জলের মধ্যে গাছগুলোর নীলাভ ছায়ার দিকে তাকিয়ে তারা খানিকক্ষণ চুপ করে' রইলো।

সূর্য্যমুখী

হঠাৎ উঠলো হাওয়া, উতলা দক্ষিণে হাওয়া, বিকেলের বুকের উপর একটুখানি বসন্ত লুটিয়ে পড়লো। খালের ম্লান জল উঠলো শিরশির্ করে', একটা অলস হাঁস ভেসে গেলো, জলের ভিতরে গাছের স্থির ছবি গেলো ভেঙে। তারা দু'জনে দু'দিকে তাকিয়ে রইলো, কেউ কিছু বললে না।

ঘোলাটে হ'য়ে এলো আলো ; ছায়াগুলো যেন পরস্পরকে তাড়া করছে, ছটফট করছে রাত্রিতে মিশে যেতে। মৃদু ঢেউয়ের মত হাওয়া এসে লাগলো তাদের বুকে। হাঁসটা পাড়ে উঠে এসে পাখার জল ঝাড়ছে, মুক্তোর মত ঝরে' পড়ছে জলের ফোঁটা। গাছগুলোর মাথায় সোনার কুয়াশা লেগে রয়েছে যেন। আর হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে, হাওয়া বইছে, যে-হাওয়া ফুল ফোটায়, যে-হাওয়ার রক্ত মাতাল হ'য়ে ওঠে।

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এলো শিশুর আনন্দ-ধ্বনি। যেন চমকে উঠে মিহির মুখ ফিরিয়ে তাপসীর দিকে তাকালো। তাদের চোখোচোখি হ'লো। এক দীর্ঘ নিবিড় মুহূর্ত্ত তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো; তারপর মিহির আস্তে হাত বাড়িয়ে তাপসীর একখানা হাত তুলে নিলে। বললে, 'আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।'

মুহূর্ত্তকাল তাপসী চুপ করে' রইলো. কেঁপে উঠলো তার চোখের পাতা। তারপর :

'এ-কথা কেন বলছো ?'

'তুমি যদি জানতে !' প্রায় অস্ফুটস্বরে মিহির বলে' উঠলো।

'জানি, জানি। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারো না ?'

আর-একবার তাদের চোখ পরস্পরের মধ্যে মগ্ন হ'য়ে গেলো। একটা মুহূর্ত্ত কাটলো। তাপসীর কালো চুলে ঝলসে উঠলো ঘোলা আলো। মিহিরের হাতের উপর একটু চাপ দিয়ে সে বললে:

'এত ভয় কেন তোমার ?'

'আমাকে ছেড়ে যেয়ো না', মিহির সম্মোহিতের মত বললে, 'আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।'

'কী ভাবছো তুমি বলো তো ?'

'আমি নিজেকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমি ভুল করেছি।'

'কিন্তু এখন তো আর কিছুতে কিছু এসে যায় না।'

'আমার জানা উচিত ছিলো। হয়-তো—যদি অপেক্ষা করতুম—'

'বোলো না', তাপসী ব্যাকুলস্বরে বলে' উঠলো, 'ও-সব বোলো না। এতে কি তুমি খুসি নও ?'

মিহির মাথা নিচু করে' চুপ করে' রইলো। তাপসী আবার বললে, 'এ-ই কি যথেষ্ট নয় ? সমস্ত পৃথিবীতে আর কী আছে, বলো ?'

সূর্য্যমুখী

মিহির চোখ তুলে এতক্ষণে প্রায় ঝাপসা হ'য়ে আসা গাছগুলোর দিকে তাকালো :

'না, আর-কিছু নেই। সে-ই তো ভয়, তাপসী।'

'সে-ই তো সুখ। আর-কিছু তুমি কেন ভাবছো? চেয়ে দ্যাখো, আমার দিকে চেয়ে দ্যাখো। তুমি বুঝতে পারো না?'

'তাপসী, এ আমি সইতে পারছিনে।'

তারপর দু'জনেই চুপচাপ। এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেলো তাদের মাথার উপর দিয়ে। খালের ঝিলিমিলি-জল থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে। ফিকে আকাশ ছড়িয়ে পড়ছে বনের সৌরভের মত।

এমনি তারা বসে' রইলো অনেক্ষণ, হাতে হাত ধরে', ম্লান জলের দিকে তাকিয়ে, সন্ধ্যায় আচ্ছন্ন। অনেক কথা বুদ্বুদের মত ভেসে উঠলো তাদের মনে, মিলিয়ে গেলো। ভাষা নেই; কোনো কথা বলা যায় না। চারদিক চুপচাপ হ'য়ে এলো, নামলো ছায়া। গাছগুলো সেই ছায়া-স্নানে অস্পষ্ট। দু'জনে তাকিয়ে রইলো সেইদিকে, জীবনের দিগন্তরেখার দিকে যেন। হাওয়ার একটা চূর্ণালক তাপসীর কপালের উপর এসে পড়লো, যেন কার নিঃশ্বাস লাগলো তার মুখে। হঠাৎ সে কেঁপে উঠলো।

'চলো', নিঃশ্বাসের স্বরে সে বললে।

সন্ধ্যার একটু পরেই মিহির বাড়ি ফিরলো। তাপসীর সঙ্গে

বেশিক্ষণ থাকতে সে সহ্য করতে পারছিলো না। চুপে-চুপে সে তার ঘরে ঢুকলো, যেন ভয়ে-ভয়ে। তার মনে একটু ঘা সইবে না এখন। এ সে কিছুতেই ভাঙতে দিতে পারে না, তার মনের এই অপরূপ মূর্চ্ছা। সে বসে' পড়লো একটা ইজি-চেয়ারে, জামা-কাপড় বদলাবার কথা মনে হ'লো না। তুলে নিলে একটা বই—পড়বার জন্যে নয়, অভ্যাস থেকে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো ছাপানো পৃষ্ঠার দিকে, দৃষ্টিহীন চোখে। তারপর তার খেয়াল হ'লো তার চা খাওয়া হয়নি, আর তার একটু মাথা ধরেছে।

হৈমন্তী এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'চা কি খেয়ে এসেছিস?'

'না, দাও।'

আর যখন সে তার বিলম্বিত চা খাচ্ছে, আর মৃণাল ব্যস্ত রান্নাঘরে, হৈমন্তী ছেলের খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। মিহিরের সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠলো। আর তার নাড়িতে-নাড়িতে মুহূর্ত্তে বয়ে' গেলো অজ্ঞাত, নামহীন একটা ভয়।

'একটা কথা আছে তোর সঙ্গে।'

অন্য-কোনো দিন কি হ'তে পারে না? কাল? যে-কোনো দিন? কিন্তু আজ নয়, এখন নয়। এখন সে সইতে পারবে না। কিন্তু সে কিছু বললে না, কিছু বলতে গেলেই তো মনে আঁচড় পড়বে।

'মৃণালের সম্বন্ধে একটা কথা।'

সাদা হ'য়ে গেলো মিহিরের মুখ। অতি ক্ষীণস্বরে সে উচ্চারণ করলে, 'কী, বলো?'

'ওকে নিয়ে কাল একবার সেবা-সদনে যাবি?'

'ওর অসুখ করেছে?'

'না। বোধ হয়—বোধ হয় ওর ছেলে হবে।'

'মা!' মিহির অদ্ভুত, চাপা গলায় চীৎকার করে' উঠলো। আর-কিছু বললে না। হৈমন্তী আরো অনেক কথা বলে' গেলেন, সে অস্পষ্ট চোখে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। কিছু শুনলে না, কিছু বললে না। মা, তার মনের মধ্যে শুধু এই একটা কথার ঢেউ উঠছিলো। মা, শেষ পর্য্যন্ত তোমারই জয় হ'লো।

১০

মা, তোমারই জয় হ'লো। পৃথিবীতে আরো একজন মা, ক্ষমতায় নিষ্ঠুর, সঙ্কল্পে অপরাজেয়। প্রাণের নাভি-উৎস থেকে উৎসারিত চিরন্তন বন্ধন। সেই অন্ধকারে আমাদের জীবনের মূল। অন্ধকার সেই নাভি-কূপ, প্রাণ-কেন্দ্র, তার সঙ্গে আমাদের আত্মার সীমাহীন বৃত্ত-রচনা। তার মধ্যে আমরা বন্দী। নাড়ি কেটে ফেলা হয়, কিন্তু সংযোগ ছিন্ন হয় না: তা থেকে যায়, অবিচ্ছেদ্য, অনস্বীকার্য্য, আমাদের সমস্ত জীবন ভরে', আমাদের শৈশব কাটিয়ে ওঠবার অনেক পরে: মা যখন চিতায় ভস্ম হ'য়ে গেছেন, তারও পরে। মাতৃ-নাভির সঙ্গে সেই সংযোগ-বৃত্তের মধ্যে চিরকাল আমাদের চলাফেরা; চিরকাল তার সঙ্গে আত্মার তন্তুতে-তন্তুতে আমরা জড়িত। আর মিহির—সে আরো একজন মা তৈরি ক'রলে: যে-মেয়ে তার আত্মার কোনোখানে নেই, তাকে সে মা করলে। তাকে দিলে ভীষণ মাতৃশক্তি। যাকে সে আর-কিছু দেয়নি, যাকে সে ভুলে' থাকতে চেয়েছে, মুছে ফেলতে চেয়েছে, যার সঙ্গে কখনো তার কোনো প্রকৃত সংস্পর্শের আলো জ্বলেনি, তাকে দিলে সেই ইচ্ছার নিষ্ঠুর শক্তি, যার কাছে তার নিজের জীবন পরাজিত, লাঞ্ছিত, বিখণ্ডিত। আর মৃণালের সেই ক্ষমতা যার উপর সে তো সে-ই, সে তো তারই সত্তা নতুন করে' জন্ম নিয়েছে; আর তার ভিতর দিয়ে মৃণালের

অন্ধ ইচ্ছা তো জয়ী হচ্ছে তারই উপরে, মিহিরেরই জীবনের উপরে।

আচ্ছা। কিন্তু এ-ই চরম নয় ; এ ছাড়াও আছে, এর বাইরেও আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা কেবল আমাদের শরীরের মধ্যেই বাঁচি না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মানুষের এমন দুরবস্থা কখনো হয় না যে সে তার জীবনকে অন্ধকারে পেতে না পারে। অন্তত মিহিরের মত মানুষের হয় না। সে তা হ'তে দেবে না কিছুতেই। তার জীবনের একটা নিভৃত অন্ধকার আছে যা তার নিজের। যা হয় হোক্, তার উপর দখল সে ছাড়বে না। শরীরের জীবনে সে পরাস্ত ; কিন্তু তার সেই অন্ধকার জীবনের খোঁজ কেউ জানে না। কোনো মা, কোনো স্ত্রী সেখানে আসতে পারে না তাদের শরীর-শক্তি নিয়ে ; বাড়াতে পারে না তাদের নরম, নির্ম্মম হাত। তাদের জন্য নিজেকে সে টুকরো করে ফেলবে, যদি করতেই হয়, কিন্তু সেই অন্ধকার থাকবে সম্পূর্ণ, সঙ্গোপন, অব্যাহত।

সুতরাং ব্যাপার যেমন ছিলো তেমনি রইলো। যে-স্ত্রী মা হ'তে চলেছে, তার প্রতি স্বামীর যা-কিছু কর্ত্তব্য, মিহির সব করলে। তাকে নিয়ে যায় মাঝে-মাঝে সেবা-সদনে, তার সঙ্গে গল্প করে, তার জন্য নিয়ে আসে ছোট-খাটো উপহার। তার মা-র সঙ্গে সে লড়বে শেষ পর্য্যন্ত ; হেরে গিয়েও সে হার মানবে না।

সূর্য্যমুখী

কিন্তু ভিতরে-ভিতরে সে রইলো বিচ্ছিন্ন, নিঃসম্পর্ক। প্রথম ধাক্কা যখন কেটে গেলো, মিহির বললে নিজের মনে, 'হোক না. কী এসে যায়?' তাপসীর কথা তার মনে পড়লো: 'এখন আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না।' না, এখন আর কিছুই এসে দাঁড়াতে পারে না তাদের মাঝখানে। যা হবার হোক্। কিছুই আর একে নষ্ট করে' দিতে পারে না। 'অসময় বলে' কি ঈশ্বরকে দোষ দেবো?' মিহির মনে-মনে বললে, 'বলবো কি—হ'লো যদি, দু'দিন আগে কেন হ'লো না?' ওরে মূঢ় হৃদয়, চুপ কর্, চুপ কর্, হ'তে যে পারলো, এ-ই কি কম আশ্চর্য্য! যা হয়েছে, দু'হাত ভরে' তাকে নে, জীবন ভরে' তাকে নে।

১১

মাসগুলো কেটে যেতে লাগলো। আবার বর্ষা এলো, বর্ষা ফুরিয়ে এলো। মৃণালের শরীর উঠলো ভারি হ'য়ে, তার পদক্ষেপ মন্থরতরো। হঠাৎ কেঁপে-কেঁপে উঠছে তার এতদিনের স্তব্ধ দৃষ্টি। ম্লান হ'য়ে এসেছে তার মুখের অগ্নি-আভা। সেই পোকা, সেই ব্যাঙ, সেই মাছ—যা একটু-একটু করে' মানুষ হ'য়ে উঠেছে, যা এতদিনে প্রায় মানুষ হ'য়ে উঠেছে, তা শোষণ করে' নিচ্ছে তার সমস্ত যৌবন, যৌবনের জীবন্ত রক্ত।

এক রাত্রে, সময় যখন আসন্ন, মৃণাল চুপ করে' তার স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালো। মিহির বই পড়ছিলো, চোখ তুললো না। কিন্তু মৃণাল সরে' গেলো না; অনেক, অনেকক্ষণ ধরে' তাকিয়ে রইলো তার স্বামীর নিবিড়, নিবদ্ধ মুখের দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে একখানা হাত এনে রাখলো স্বামীর হাতের উপর।

এ-রকম সে কখনো করে না। মিহির চমকে উঠলো। বই-খানা কোলের উপর নামিয়ে রেখে চাইলো চোখ তুলে। মৃণালকে যেন বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বেচারা! হয়-তো তার মনে ভয় হচ্ছে। হয়-তো সে কিছু বলতে চায়; হয়-তো সে একটু আশ্বাস চায়।

মৃণালের হাতের উপর আস্তে একটু হাত বুলিয়ে সে বললে: 'কেমন আছো?' খুব নরম সুরে বললে, যেমন করে' আমরা শিশুর সঙ্গে কথা কই, কি রোগীর সঙ্গে।

'আমার তো কিছু হয়নি।'

'কিন্তু তোমাকে আজ ভালো দেখাচ্ছে না।'

'ও কিছুনয়।' তারপর, একটু চুপ থেকে :

'তোমার একটু সময় হবে?'

মিহির বইখানা বন্ধ করে' টেবিলের উপর সরিয়ে রাখলো :

'কিছু বলবে? বলো না।'

মৃণালের আঙুলগুলো মিহিরের আঙুলের সঙ্গে জড়িয়ে গেলো। মিহির অনুভব করতে পারলে চামড়ার উপর তার নখের ক্ষীণ স্পর্শ। হঠাৎ মৃণাল বললে :

'আমার উপর তুমি রাগ কোরো না।'

মিহির অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালো।—'রাগ কেন করবো?'

'আমাকে দোষ দিয়ো না', মনে-মনে, রুদ্ধস্বরে মৃণাল বলে' উঠলো। 'আমাকে দোষ দিয়ো না।'

মিহির তার হাত ছাড়িয়ে নিলে :

'এ-সব কী তুমি বলছো?'

'এটা তুমি জেনো, আমার কিছু দোষ নয়', মৃণাল বলতে লাগলো। 'আমি কখনো তোমার ভালোবাসা চাইনি। আমি কখনো—'

মিহির তার একখানা হাত কব্জির কাছে ধরে' তাকে বাধা দিলে :

'যাও, এখন শোও গে। তোমার শরীর ভালো নেই।'

'আমাকে একটু বলতে দাও, তোমার পায়ে পড়ি।'

'যাও, শুয়ে থাকো গে,' মিহির আবার বললে।

কয়েক মুহূর্ত্ত, মৃণাল স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। তার চোখ দিয়ে যেন ঝরে' পড়ছে তার প্রাণ-স্রোত, মিহিরকে সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরে'। তারপর যেন অসহ্য কষ্টে, অতি ক্ষীণস্বরে :

'কেন তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে?'

মিহিরের উপর যেন একটা মোহ ছড়িয়ে পড়লো। সে কিছু বলতে পারলে না, কিছু ভাবতে পারলে না। আরো শক্ত হ'লো তার মুঠি মৃণালের কব্জির উপর। আর মৃণাল বলতে লাগলো, অস্পষ্ট স্বরে, যেন নিজেরই মনে-মনে :

'তবু ভালোই বলবো। তবু যে তোমার দেখা পেয়েছিলুম এ-ই আমার সুখ। তুমি কি জানো—তুমি কি কখনো ভাবতে পারো আমি তোমাকে কত ভালোবেসেছিলুম?'

যেন অন্য কেউ কথা বলছে, যেন মৃণালের অচৈতন্য থেকে কোনো প্রচণ্ড, অদম্য শক্তি ঠেলে বার করছে এই কথাগুলো—তাকে দীর্ণ করে', তাকে বিধ্বস্ত করে'। নামলো নীরবতা, তার যেন কখনো শেষ হবে না। তারপর :

'তুমি কি কখনো আমাকে এতটুকু ভালোবাসতে পারবে না?'

মিহির মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলো মৃণালের মুখে। যে-মুঠো

দিয়ে সে তার কব্জি ধরে' ছিলো তা এলো শিথিল হ'য়ে। আর-একটা দীর্ঘ, অসহ্য নীরবতার ছেদ।

মৃণাল আস্তে-আস্তে তার হাত ছাড়িয়ে নিলে :

'বুঝলুম। খামকা ব্যথা দিলুম তোমার মনে—ক্ষমা কোরো', বলে' সে এক পা সরে' গেলো। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে, অশরীরী প্রেত-স্বরে :

'কিছুই কি তোমার বলবার নেই ?'

মিহিরের ঠোঁট নড়ে' উঠলো। সে যেন প্রাণপ্রণ চেষ্টা করছে কিছু বলতে, কিন্তু কোনো কথা বেরুলো না।

'থাক্,' মৃণাল বললে, 'থাক্। নিজেকে তুমি আর কষ্ট দিয়ো না, আমি যাচ্ছি।' তারপর, টেব্‌ল্‌-ল্যাম্পের তৈরি আবছায়ার ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে :

'তুমি মন-খারাপ কোরো না, আমার কোনো নালিশ নেই। আমি তো তোমাকে ভালোবেসেছিলুম। তোমাকে ভালোবেসেই আমি সুখী হয়েছিলুম।'

এর কয়েকদিন পরেই, সন্ধের একটু পরে মৃণাল তার সংসার তার কাজ, সমস্ত ফেলে রেখে শুয়ে পড়লো বিছানায়, রুগ্ন পশুর মত। হৈমন্তী তার কাছে গিয়ে তার কপালে হাত রাখলেন।

'কী রে ?'

মৃণাল কিছু বললে না, শুধু তার বড়-বড় কালো চোখ তুলে তাকালো।

হৈমন্তী খানিক্ষণ ধরে' তার দিকে তাকিয়ে বললেন : 'একটু ওঠো। খেয়ে নাও যা পারো।'

'না, খাবো না।'

'খাবে বইকি। খেতেই হবে। ওঠো।'

তাকে নিয়ে গেলেন খাবার ঘরে, বসলেন তার কাছে। বললেন, 'ভয় নেই, ভয় নেই কিছু।'

মৃণাল কিছুই খেতে পারলে না, ফেলে-ছড়িয়ে উঠে এলো। 'বেশ, এতেই হবে,' হৈমন্তী বললেন, 'এসো এবার।'

তাদের শোবার ঘরের পাশে ছোট একটা ঘর প্রস্তুত ছিলো, সেখানে গিয়ে মৃণাল শুয়ে পড়লো। হৈমন্তী লোক পাঠালেন সেবা-সদনে ; একবার দেখে নিলেন সমস্ত ওষুধ-পত্র ঠিক আছে কিনা, তারপর এসে বসলেন তার পাশে। ঘরের আলো নেবানো ; অন্ধকারে শোনা যাচ্ছে মৃণালের ভারি, অসমান নিঃশ্বাস।

'কষ্ট হচ্ছে খুব?' হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলেন।

'না, মা।'

'ভয় কোরো না, চুপ করে' থাকো।'

মৃণাল চুপ করে' রইলো। কিন্তু চুপ করে' থাকা কঠিনতরো হ'য়ে উঠছিলো প্রতি মুহূর্ত্তেই। তার মাংস কেউ যেন ছিঁড়ে

নিয়ে যাচ্ছে। এমন যন্ত্রণা যে পৃথিবীতে আছে, সে কখনো ভাবেনি। দাঁতে দাঁত চেপে, দু'হাতের মুঠি শক্ত করে' আঁকড়ে ধরে' নিশ্চল, নিঃস্পন্দ, সে পড়ে' রইলো। চেষ্টা করলো অজ্ঞান হ'য়ে যেতে।

কিন্তু তার ধৈর্য্যও ভাঙলো। মিহির যখন বাড়ি ফিরে এলো, রাত দশটায়, সে শুনলো সমস্ত বাড়ি ভরে' মৃণালের গোঙানি। নরম, দীর্ঘ আওয়াজ, আস্তে-আস্তে পরদা থেকে পরদায় উঠে যাচ্ছে, যেন রাত্রির কোনো অশুভ পাখি ডেকে উঠছে থেকে-থেকে। ঘরের ভেজানো দরজায় টোকা দিয়ে সে ডাকলে, 'মা।'

হেমন্তী বেরিয়ে এলেন।

'কখন আরম্ভ হয়েছে?'

'সন্ধের পরেই।'

'আগে জানলে আমি আর আজ বেরোতাম না।'

'তুই থেকেই বা কী করতিস?'

'নার্স এসেছে?'

'হ্যাঁ, এসেছে। তুই যা, কোনো ভাবনা নেই।'

'সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে সব। তুই যা, খেয়ে নে গে। ভাত চাপা দেয়া আছে—কিছু দরকার হ'লে দুর্গাকে ডেকে বলিস।'

খেতে বসে' মিহিরের বড় অবাক লাগলো যে আজ তার

খাবার কাছে মৃণাল নেই। এতখানি সময়ের মধ্যে এ-রকম কখনো হয়নি। একদিন মৃণালের একটু অসুখ করেনি—আশ্চর্য্য ভালো তার স্বাস্থ্য। কখনো কোনো রোগের কষ্ট সে পায়নি, আর আজ, এখন—কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে সে যাচ্ছে।

অন্যমনস্কভাবে মিহির খেয়ে উঠলো। থেকে-থেকে তার কানে এসে লাগছে গোঙানির আওয়াজ। তা যেন বাড়ছে। ভারি অস্বস্তি লাগছিলো তার—যে-কোনো মানুষকে চোখের উপর এ-রকম যন্ত্রণা পেতে কী করে' দেখা যায়? এবং কিছু করবার নেই, কিছু যে করবার নেই এটাই সব চেয়ে খারাপ।

দুর্গার সাজা একটা পান মুখে পুরে সে আবার সেই ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

'মা,' সে একটু চেঁচিয়ে ডাকলো।

হৈমন্তী বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'খেয়েছিস?'

'কত দেরি আর?'

'দেরি আছে।'

'এখনো দেরি?'

'অমন হয়ই।'

মিহির একটু ইতস্তত করে' বললে, 'ওকে একটু দেখা যায় না?'

'কী করবি দেখে?'

'কেমন আছে ও?'

'ভালো। ভালোই আছে।'

মিহির আবার একটু চুপ করে' রইলো।

'মা, খুব কি কষ্ট?'

'কষ্ট তো একটু হয়ই।'

'খুব?'

হৈমন্তী হেসে ফেললেন। 'তুই যা এখান থেকে। ঘুমোবার চেষ্টা কর্।'

মিহির তবু দাঁড়িয়ে রইলো, যেন কী বলতে চায়। তখন হৈমন্তী বললেন, 'আয়, ওকে একটু দেখেই যা।'

মিহির দাঁড়ালো চৌকাঠের ধারে। ঘরটি মেয়েতে ভর্ত্তি— নার্স, মৃণালের মা আর পিসিমা, বোতল আর ফ্ল্যানেলের টুকরো আর আগুনের হাঁড়ি নিয়ে সবাই ব্যস্ত। একটা উত্তপ্ত গন্ধ ঘরের বাতাসে। নীল বাল্‌বে জ্বলছে আলো। বিছানায় পড়ে' আছে মৃণাল, তার চোখ বোজা, ঠোঁট আটকানো। তাকে দেখে বিশ্বাস করা শক্ত যে তারই ভিতর থেকে এই দীর্ঘ, অবিশ্রান্ত গোঙানি বেরিয়ে আসছে। মিহির একটু আশ্বস্ত হ'লো। যতটা মনে হয়, হয়-তো সত্যি-সত্যি তেমন ভয়ানক কিছু ব্যাপার নয়।

হঠাৎ ভাবী মা একটু চুপ করলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে মিহিরের মুখের উপর এসে পড়লো মৃণালের বিশাল উজ্জ্বল

চোখ, যন্ত্রণায় বিস্ফারিত, তার কালো গভীরতায় কী কথা যেন আলোড়িত হ'য়ে উঠছে। আর মিহিরের বুকের ভিতর দিয়ে যেন একটা আগুনের স্রোত নেমে গেলো, তাড়াতাড়ি সে সরে' গেলো সেখান থেকে।

নিজের ঘরে এসে চেয়ারে বসে' সে পড়বার চেষ্টা করলে। শুতে যাবার কথা ভাবা অসম্ভব। প্রকাণ্ড, শক্ত খাটের উপর শুভ্র মসৃণ শয্যার দিকে সে তাকালো। মৃণালই পেতেছিলো নিজ হাতে, সন্ধ্যার আগে। তার নিজের বালিস দুটো যেখানে থাকবার কথা, সেখানেই রয়েছে।

রাত বাড়লো। চারদিক চুপচাপ হ'য়ে আসছে। কোথায় ডেকে উঠছে অশান্ত, ক্ষুধিত কুকুর। পড়া অসম্ভব, বসে' থাকা অসম্ভব। মিহির উঠে পায়চারি করতে লাগলো ঘরের মধ্যে। আর হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ, তীব্র চীৎকার বাড়ির প্রান্ত থেকে প্রান্তে বেজে উঠলো। মিহির নিজেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো, তা এমন ভয়ানক। সে থমকে দাঁড়ালো। আর তা চলতে লাগলো, সেই নগ্ন নিষ্ঠুর চীৎকার। যে-মেয়ে কখনো মৃদুস্বরে ছাড়া কথা বলেনি, তার চীৎকারে সমস্ত রাত্রি খানখান হ'য়ে ভেঙে পড়ছে।

বারোটার পর হৈমন্তী এসে বললেন, 'একজন ডাক্তার নিয়ে আয় বরং।'

'খুব কি খারাপ, মা, খুব কি খারাপ ?'

'ডাক্তার একজন থাকা ভালো, তুই যা।'

রাস্তায় বেরিয়ে মিহির যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। চীৎকার ভেসে এলো তার পিছন-পিছন অনেকদূর পর্য্যন্ত। তারপর তা আর শোনা গেলো না। আর হঠাৎ মিহিরের মনে হ'লো :

'যদি ও মরে' যায়, যদি ও মরে' যায়।'

বাকিটা রাত দুঃস্বপ্নের মত কাটলো। মিহির ভালো করে' কিছু টের পেলো না। ঢেউয়ের পর ঢেউ, থেকে থেকে বেজে উঠছে চীৎকার ; শুনতে-শুনতে সে প্রায় পাগল হ'য়ে গেলো। তারপর এক সময়ে তা থামলো, মৃণাল মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লো। হঠাৎ সমস্ত বাড়িতে অদ্ভুত অস্বাভাবিক স্তব্ধতা।

ভোরের দিকে ডাক্তার বললে, 'বড় কঠিন প্রসব, একজনের প্রাণের আশঙ্কা।' জানা গেলো, মৃণালের শরীরের গঠনে কোথায় কী একটা দোষ আছে ; সত্যি বলতে, মাতৃত্বের সে ঠিক উপযুক্তই নয়।

'কোনো উপায় কি নেই এখন ?'

'চেষ্টা করবো যথাসাধ্য। চেষ্টা করবো দু'জনকেই বাঁচাতে। বলা যায় না।'

'শিশু না-হয় মরলোই।'

'দেখি।'

ভোরের প্রথম আলোর সঙ্গে-সঙ্গে ফরসেপ্‌স্‌ দিয়ে টেনে বার করা হ'লো লাল মাংসের একটা পিণ্ড। মাথাটা চেপ্টে গেলো। সেটার নিঃশ্বাস পড়ে না, সেটা কাঁদে না। যাক্‌, আপদ গেছে।

কিন্তু নব-মাতার মূর্চ্ছা ভাঙলো না। হৈমন্তী তার গালের উপর হাত রাখলেন, এখনো তা উষ্ণ। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ভালো করে' একটু দেখুন ডাক্তারবাবু, আরো ভালো করে' দেখুন।'

'এখন ছেলেটাকে দেখবার দরকার।'

কিন্তু ইতিমধ্যে মৃণালের মা সেই লাল মাংসপিণ্ডকে তুলে নিয়ে জোরে তার গা রগড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ সে পরম উল্লাস কেঁদে উঠলো, যেন ঘোষণা করলে, 'আমি এসেছি।'

আলো ফুটলো আকাশে। ডাক্তার নিজেরই অসুস্থ চেহারা করে' বাড়ি ফিরলো। মৃণালের মা শিশুকে কোলে করে' বসে' আছেন, তাঁর চোখ দিয়ে যে জল পড়ছে তিনি নিজেই তা টের পাচ্ছেন না। হৈমন্তী মৃণালের শিয়রে বসে' ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তা ছাড়া সমস্ত চুপচাপ; ঝড়ের রাত্রির পর শান্তি।

তখন মিহির গেলো সেই ঘরে, দাঁড়ালো মৃণালের পাশে। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়ছে তার বিছানায়। তার চোখ বোজা, দীর্ঘ, কালো পলকগুলো প্রায় গাল ছুঁয়েছে। তার হাত দুটি দু'পাশে এলিয়ে আছে, কয়েকটা চুল স্খলিত হ'য়ে পড়েছে

কপালে। যেন ঘুমিয়ে আছে। তার ঠোঁটের কোণে যেন হাসির একটু আভাস। মিহির অনেকক্ষণ চুপ করে' তাকিয়ে রইলো, দেখলো। তার ইচ্ছে হ'লো একটু স্পর্শ করে, সাহস হ'লো না। অনেক, অনেকদূর; তাকে এখন আর ছোঁয়া যায় না। একটু হাসির আভাস তার ঠোঁটে—সে যেন কী গোপন কথা জানে, যেন তাকে নিয়ে গেছে সঙ্গে করে', সে-কথা আর কেউ জানবে না।—সে এখন একা।

কী ভয়াঙ্কর একা, মিহির ভাবলে।

১২

মৃণালের মা শিশুকে নিয়ে চলে' গেলেন, আবার বাড়িতে মা আর ছেলে। কিন্তু সে-বাড়ি আর নয়। এখানে আর সহজে নিঃশ্বাস ফেলা যায় না। সারাক্ষণ কী যেন ফিস্‌ফিস, ফিস্‌ফিস্‌ করছে। সমস্ত বাড়ি ভরে' ছড়িয়ে রয়েছে মৃণাল। চলতে ফিরতে তার উপর হোঁচট খেয়ে পড়তে হয়। তাকে না-ছুঁয়ে একটা কাজ করবার উপায় নেই। সমস্ত বাড়ি সে ভরে' রয়েছে, আচ্ছন্ন করে' রয়েছে, সমস্ত বাড়ি সে চেপে ধরেছে তার অদৃশ্য সত্তা দিয়ে। কে জানে মানুষের কোনো প্রেত-সত্তা আছে কিনা, কিন্তু এই তো সব চেয়ে ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর প্রেত—কখনো তা ছাড়া দেয় না, প্রতি মুহূর্ত্তে তা হানা দিচ্ছে, প্রতি মুহূর্ত্তে। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে বসে' মিহিরের মনে পড়ে :

'এই সময় সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো।'

রাত্রিতে বিছানায় শুতে গিয়ে মনে পড়ে : 'ঐখানটায় সে ঘুমিয়ে থাকতো।'

খেতে বসে' ভালো করে' খেতে পারে না ; মনে-মনে বলে, 'ওখানে সে বসতো, সাড়ির কালো পাড় তার পায়ে এসে পড়েছে।'

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে হয়-তো দেখতো, ন'টা বেজেছে, আর তার মনে হ'তো : 'এই সময়ে বাথরুম থেকে তার

স্নানের চলচলানি শুনতে পেতুম।' আয়নার দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভিতরটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে ওঠে :

'এ-আয়নায় তার ছায়া আর পড়বে না।'

আর সেই বাড়ি যেন মিহিরের মনে অদ্ভুত একটা মোহ বিস্তার করলে, হ'য়ে উঠলো তার আত্মার একটা অংশ। সেখানে থাকতে তার অসহ্য লাগে, কিন্তু সেখান থেকে সে বেরোতেও পারে না। সারাদিন সে বাড়ি বসে' থাকে, কিছু করে না। শুধু চুপ করে' তাকিয়ে বসে' থাকে। আর অনুভব করে, বাড়িটা তাকে জড়িয়ে ধরছে, তাকে ভরে' তুলছে। মনে-মনে বোঝে যে এ অসম্ভব, এ-রকম করে' বাঁচা যাবে না, কিন্তু এড়াতেও পারে না। বাড়িটার যেন আলাদা একটা সত্তা ফুটে উঠছে—তা কথা কয়, তা কথা কয়। মিহির চুপ করে' শোনে।

কাটলো একমাস। কিছু বদলালো না। বাড়িটা কথা কয়। ফিস্‌ফিস্, ফিস্‌ফিস্। রাত্রিতে ঘুম হয় না। হাওয়ার মধ্যে কী যেন ভেসে বেড়ায়। আর তার শক্তি যেন ক্রমশই বাড়ছে, এই বাড়ির, এই পরিপূর্ণ জীবন্ত শূন্যতার। না, সত্যি এ-বাড়িতে থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠছে।

শেষটায় একদিন হৈমন্তী বললেন : 'অনেকদিন মনে-মনে ভেবেছি তীর্থগুলো ঘুরে আসবো। এতদিন কেবলই মনে হয়েছে

সময় নেই, এইবার দেবতা সময় করে' দিয়েছেন। তুই আমাকে নিয়ে চল্।'

মিহির বুঝলো। বললে, 'চলো।'

'তা হ'লে খামকা দেরি করে' লাভ নেই।'

'না, সব ব্যবস্থা করে' ফেলো।'

তাপসী একটা চিঠি লিখেছিলো মিহিরের স্ত্রী-বিয়োগের খবর পেয়ে, তার উত্তর দেয়া হয়নি। যেদিন তাদের কলকাতা ছেড়ে যাবার কথা, তার কয়েকদিন আগে মিহির ছোট একটা চিঠি লিখলে :

'মা-কে নিয়ে বাইরে যাচ্ছি শিগগিরই। কোন্-কোন্ জায়গায় যাবো এবং কবে ফিরবো এখনো কিছু ঠিক নেই। হয়-তো শিগগির না-ও ফিরতে পারি। তোমার সঙ্গে দেখা করবার সময় হ'লো না। এমন যদি হয় যে তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'লো না, এ-কথা মনে কোরো যে তোমাকে কখনো ভুলবো না।'

আর পরের দিন বিকেলে মিহির যখন তার স্থানীয় সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখছে, আর-কিছু করবার নেই বলে', সময় কাটাতে হবে বলে', ঘরের পরদা সরিয়ে এক স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখা দিলে। লাফিয়ে উঠলো মিহিরের হৃৎপিণ্ড, এমন প্রবলভাবে সে চমকে উঠলো যে কাগজের উপর ন্যস্ত তার কলমের নিব নিচের দিকে একটা আঁকাবাঁকা লাইন টেনে গেলো। পরমুহূর্ত্তে :

'ও, তুমি,' নিঃশ্বাস ছেড়ে মিহির বললে।

তাপসী তার দিকে এগিয়ে এলো।—'তোমাকে দেখতে এলুম।' তারপর, তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে :

'কী চেহারা হয়েছে তোমার!'

মিহির কাগজ-কলম সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো।—'বোসো। না—ওখানে নয়, এসো এদিকে।'

জানলার নিচে একটা সেটি, সেখানে তাপসী বসলো। মিহির দাঁড়িয়ে রইলো তার পাশে। একটু চুপচাপ। কিছুই যেন তাদের বলবার নেই পরস্পরকে।

'মা-কে ডেকে আনি,' মিহির বললে।

'আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। তিনিই তো আমাকে তোমার ঘর দেখিয়ে দিলেন।'

'তিনি তোমাকে কিছু বললেন?'

'না। নিজের পরিচয় দিতে যাচ্ছিলুম, তিনি বললেন "বুঝতে পেরেছি, তুমি তাপসী তো?" '

'তুমি কোনো আলাপ করলে না তাঁর সঙ্গে?'

'করবো। কিন্তু তোমার সঙ্গে আগে আমার কথা বলা দরকার। তুমি বসবে না?'

মিহির বসলো তাপসীর পাশে। তাপসী বললে :

'কতদিন তোমাকে দেখিনে।'

'তোমাকে প্রায়ই আমার মনে পড়েছে।'

'কেন যাওনি ?'

'জোর করে' যেতে চাইনি।'

তাপসী চারদিকে একবার তাকালে।—'আর এই ঘরে তুমি আবদ্ধ হ'য়ে আছো ?'

মিহির মাথা নিচু করলে, যেন লজ্জায়।—'আমি দুর্ব্বল, তাপসী, আমি দুর্ব্বল।'

'এ-ঘরের রুদ্ধ হাওয়ায় তুমি কেমন করে' বাঁচবে ?'

'সেইজন্যই তো চলে' যাচ্ছি।'

'চলে' যাচ্ছো ! কিন্তু সে তো পালিয়ে যাওয়া। পালিয়ে গিয়েই কি তুমি বাঁচবে ?'

মিহির তার চুলের মধ্যে গভীরভাবে হাত ঢুকিয়ে দিলে। 'দেখি চেষ্টা করে'।'

'না, পালিয়ে যেয়ো না। যার কাছ থেকে আমরা পালাই সে তাড়া করে আমাদের পিছন-পিছন, তাকে আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারিনে কখনো, তার কাছে আমাদের হার। মিহির, তুমি হার মেনো না।'

মিহির স্থিরদৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি কেন এলে ?'

'আমি বুঝতে পারছিলুম, বুঝতে পারছিলুম। তোমাকে

দেখতে পাচ্ছিলুম এই ঘরে, হাওয়া চেপে বসেছে তোমার বুকের উপর ভারি হ'য়ে। মিহির, এ তুমি করছো কী? এখানে যে নিঃশ্বাস পড়ে না, ছায়া থমথম করে দেয়ালের কোণে-কোণে। এ যে ভূতুড়ে বাড়ির মত মায়া দিয়ে ঘেরা। আর এই বাড়ির কাছে নিজেকে তুমি সমর্পণ করেছো, ধরা দিয়েছো সেই হাতে। নিজের তুমি কী করেছো বুঝতে পারো না?'

মিহির, তার দৃষ্টি মেঝের উপর আবদ্ধ:

'ক্ষমা করো, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। তুমি যাও।'

কিন্তু তাপসী তার একটু কাছে সরে' এলো:

'কিন্তু কেন তুমি ভয় করছো? কেন তুমি লুকিয়ে থাকছো? আমার দিকে তাকাও, আমার দিকে তাকাও।'

মিহির আস্তে-আস্তে চোখ তুললো। তাপসী বললে, 'তোমার চোখে ক্লান্তি। তোমার চোখে মৃত্যুর বাসনা। তুমি কি মরতে চাও? তুমি কি নিজেকে দিয়ে দিতে চাও, হারিয়ে ফেলতে চাও? বলো। কথা কও, মিহির, কথা কও।'

কিন্তু মিহিরকে যেন ঘিরে রয়েছে একটা মূর্চ্ছা। মৃত্যুর বাসনায় বিহ্বল চোখে তাপসীর দিকে তাকিয়ে সে বললে:

'কী বলতে হবে আমি জানিনে।'

তাপসী একটু ঘুরে বসে' সোজা মিহিরের চোখে তাকালো: 'তোমার মুখে পড়েছে এই বাড়ির ছায়া। কতকাল, আর

কতকাল নিজেকে তুমি এমন করে' নষ্ট হ'তে দেবে? জানলা খুলে দাও, জানলা খুলে দাও। ঘরে আলো আসুক, বয়ে' যাক্ বাইরের হাওয়া। মিহির, শুধু এই রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারই একমাত্র সত্য নয়, আকাশও আছে। সেই আকাশ তোমার—আর আমার। তাকে তুমি কেমন করে' ভুললে?'

কিন্তু মিহির, মূর্চ্ছা-মগ্ন, নিশ্চেতন, মাথা নাড়লে :

'এখন আর সময় নেই। আমি চলে' যাচ্ছি। তোমাকে মনে রাখবো। তাপসী, তোমাকে মনে রাখবো।'

'কেন তুমি যাবে? কোথায় যাবে? কী হবে গিয়ে? যদি হাওয়া না বয়, যদি আলো না ফোটে, যদি এই মূর্চ্ছা না ভাঙে—যেখানেই যাও, তুমি তো মরতেই যাবে। মিহির, তুমি কি মরবে বলে' পণ করেছো?'

যেন কঠিন কষ্টে মিহির উচ্চারণ করলে : 'তুমি চুপ করো, তাপসী, তুমি চুপ করো।'

'না, না,' তাপসী বলে' উঠলো। 'ওঃ, মিহির, জানলা খুলে দাও। কথা কও। হাসো। হাসতে ভয় কারো না। হাসি দিয়ে ভাঙো এই মূর্চ্ছা—এই মায়া। কঠিন, নিশ্চল এই পাথর। পাথর হ'য়ে উঠছো তুমিও যে। ভিতরে-ভিতরে তুমি পচে' উঠছো। প্রার্থনা করো সূর্য্যের কাছে, সূর্য্য তোমার মধ্যে জ্বলে' উঠুক। নতুন জন্ম হোক্ তোমার প্রাণের। ওঃ, মিহির, আমাকে

এত করে' বলতে হচ্ছে কেন? তুমি কি বুঝতে পারো না? তুমি কি বুঝতে পারো না?'

মিহির কিছু বললে না। বসে' রইলো মাথা নিচু করে', হাঁটুর উপর কনুই রেখে, চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে। তার চোখ যেন কিছু দেখছে না; তার সমস্ত শরীর ঘিরে এক বিশাল উদাসীনতা, অন্ধতা। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটলো। তারপর তাপসী আস্তে-আস্তে বললে:

'আমাকে এক গ্লাস জল দিতে পারো?'

একটি কথা না-বলে' মিহির উঠলো, দিলে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এনে। তাপসী জল খেলো, তারপর গ্লাসটা সরিয়ে রেখে:

'মনে কোরো না তোমাকে আমি বুঝতে না পারি। কিন্তু মিহির, ভালোবাসার চেয়ে ভালোবাসার দম্ভকে বড় করে' তুলো না। দুঃখের চেয়ে বড় কোরো না শোককে। তোমার দুঃখকে ভালোবেসো না, দুঃখ ভালোবাসবার জিনিস নয়। যদি মরে' গিয়ে থাকে সে তো ভালোই: মাঝে-মাঝে তো মরতেই হয়—বাঁচবারই জন্য, মিহির। মৃত্যু শেষ নয়, মৃত্যুতে তুমি থেমে থেকো না—সেটাই যে পরম মৃত্যু। মৃত্যুকে ছাড়িয়ে যাও, মৃত্যু পার হ'য়ে নতুন জীবনে। মৃত্যুতে নতুন জীবনের উৎস, জীবন নিজেকে নতুন করে' সৃষ্টি করে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে। সেই জীবনকে তুমি নাও।'

তবু মিহিরকে স্তব্ধ, অবিচলিত দেখে তাপসী উঠে দাঁড়ালো। তার সামনে দাঁড়িয়ে নির্ি 'শান্তস্বরে বললে :

'মিহির, তুমি কি মৃত্যুকে তোমার উপর জয়ী হ'তে দেবে ?'

আর হঠাৎ মিহিরেব সমস্ত শরীর যেন কেঁপে উঠলো। চোখ তুলে সে তাকালো তাপসীর দিকে, সে-চোখের গভীরতায় যেন এখনো অজ্ঞাত এক আলোর হ'য়ে-ওঠবার জন্য ছটফটানি। তাপসী বলতে লাগলো :

'জীবনকে অস্বীকার কোরো না। জীবনকে তুমি নাও, তোমার জীবনকে তুমি নাও।' তারপর, মিহিরের খুব কাছে সরে' এসে, উত্তপ্ত, ঈষৎ-কম্পিত স্বরে :

'মিহির, কি তুমি ইচ্ছে করে' মরবে, তুমি কি জীবনকে ভয় করবে ? তোমার কি সাহস হবে না নিজের জীবনকে নিতে ?'

মিহির দু'হাতে মুখ ঢেকে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে' উঠলো : 'তুমি কেন এলে ? তুমি কেন এলে ?'

'কষ্ট হচ্ছে তোমার ? হোক্—তার মানে তো এ-ই যে মূর্চ্ছা ভাঙছে, পাথর ভেঙে যাচ্ছে। তোমার মুখ তোলো, আমার দিকে তাকাও। আমি তোমার জন্য মুক্তি এনেছি, এনেছি তোমার জীবন। তা তুমি জানো, তা তুমি জানো। আর সেইজন্যই তোমার ভয়, তুমি মুখ ঢেকে আছো সেইজন্যেই।'

তাপসী মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে মিহিরের পাশে বসে' পড়লো,

'হাতে তার মাথা টেনে আনলো তার বুকের কাছে। মিহির পাংশু মুখ তুলে তাকালো, তার চোখ অশ্রুতে উজ্জ্বল।

তাপসী বললে: 'আমার মধ্যে তোমার মুক্তি, আমার মধ্যে তোমার জীবন। তুমি তা জানো, জানো, জানো। কেন তবে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছো অমন করে'? আমাকে তুমি নাও, আমাকে তুমি নাও।' বলতে-বলতে তাপসী মিহিরের ঘন চুলের উপর তার মুখ চেপে ধরলো।

কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে গড়িয়ে গেলো। তারপর দু'জনে উঠে দাঁড়ালো। তাপসী তাকালো মিহিরের চোখের মধ্যে, অশ্রুতে তার অন্ধতা ধুয়ে গেছে, তার মধ্যে সূর্যের ঝিলিমিলি। হাসবার চেষ্টা করে' তাপসী বললে, 'চলো আমার সঙ্গে একটু বেরোবে। অনেকদিন তুমি বাড়ি থেকে বেরোও না'

মিহির বললে, 'এখন আর না-বেরোলেও চলে।'

'না' তবু চলো। চলো।'

'একটু বোসো', বলে' মিহির মুখ ধুতে চলে' গেলো। সেই ফাঁকে তাপসী আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে চুলটা একটু ঠিক করে' নিলে।

দু'জনে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরুলো। সিঁড়ির কাছে এসে হৈমন্তীর সঙ্গে দেখা।

'আমি তো তোমাদের জন্য চা করতে যাচ্ছিলুম।'

'দরকার নেই, মা। আমরা বেরুচ্ছি।'

'বেরুচ্ছো ?' হৈমন্তী যেন কথাটা বুঝতে পারলেন না।

'হ্যাঁ, মা, বেরুচ্ছি।'

দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। হৈমন্তী ঠাণ্ডা, সাদা ক্ষুধিত তাকিয়ে রইলেন তাদের পিছনে :